HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অব নেশনস

টপিক – ০১ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

টপিক ০২: ত্রিশক্তি চুক্তি

টপিক ০৩: ত্রিশক্তি জোট এবং ত্রিশক্তি আঁতাত-এর শক্তির ভারসাম্য

টপিক ০৪: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

টপিক ০৫: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব

টপিক ০৬: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের কারণ

টপিক ০৭: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ

টপিক ০৮: ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

টপিক ০৯: লীগ অব নেশনস

টপিক ১০: অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

টপিক ০১: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

This Topic is important for

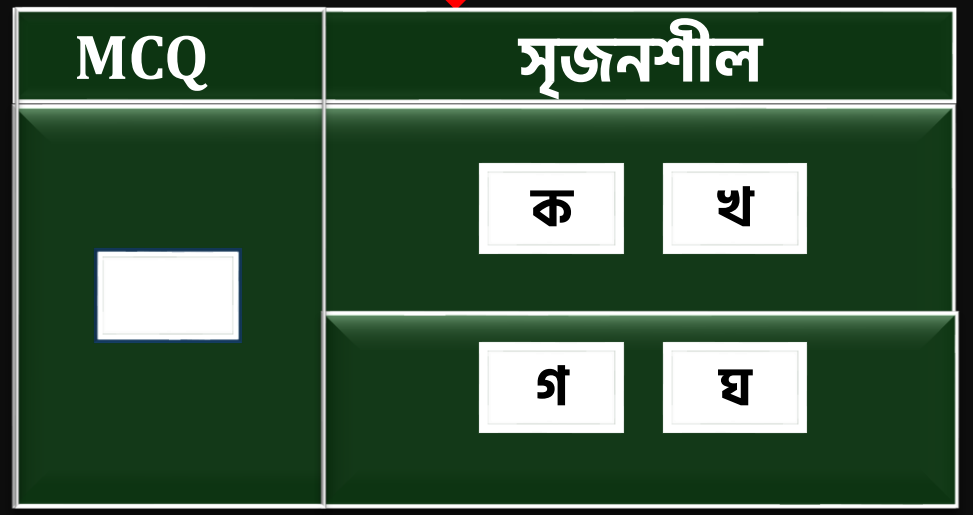

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনান্ড (Archduke Franz Ferdinand) ও তার স্ত্রী সোফিয়ার হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে। ১৯১৪ সালের জুনে যুবরাজ ফার্ডিনান্ড বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে স্ত্রী সোফিয়াসহ ভ্রমণে যান। অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ফার্ডিনান্ড সেখানে ২৮ জুন সস্ত্রীক আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ডে অস্ট্রিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অস্ট্রিয়া এজন্য সার্বিয়া সরকারকে দায়ী করে চরমপত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দেশটি ২৩ জুলাই সার্বিয়া সরকারকে কয়েকটি দাবি, সংবলিত একটি চরমপত্র দিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দাবিগুলো বাস্তবায়নের জন্য চাপ দেয়। সার্বিয়া এর কয়েকটি দাবি পূরণ করে। আর বাকি দাবিগুলোর সাথে তার সার্বভৌমত্বের বিষয়টি জড়িত উল্লেখ করে তারা একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব দেয়। এদিকে জার্মানি অস্ট্রিয়াকে সমর্থন দিলে তারা সার্বিয়ার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর অস্ট্রিয়া ২৮ জুলাই সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড আক্রমণ করে দখল করে নেয়। তখন ফ্রান্স ও রাশিয়া সার্বিয়াকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। ক্রমে ইউরোপের অন্য রাষ্ট্রগুলো এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তা বিশ্বযুদ্ধে রূপ নেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে জার্মান জাতির উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, রাশিয়া ইত্যাদি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতালি, জার্মানি এবং এশীয় শক্তি জাপান জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করে। ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিদ্বেষ বেড়ে যায়, যা তাদেরকে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করে। এছাড়া আঠারো শতকে ইউরোপে শুরু হওয়া শিল্পবিপ্লব উনিশ শতকে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ফলে শিল্পসমৃদ্ধ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো তাদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য উপনিবেশ বিস্তারের প্রতিযোগিতায় নামে। এ কারণেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে শত্রুতা বেড়ে যায় যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। সুতরাং উগ্র জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

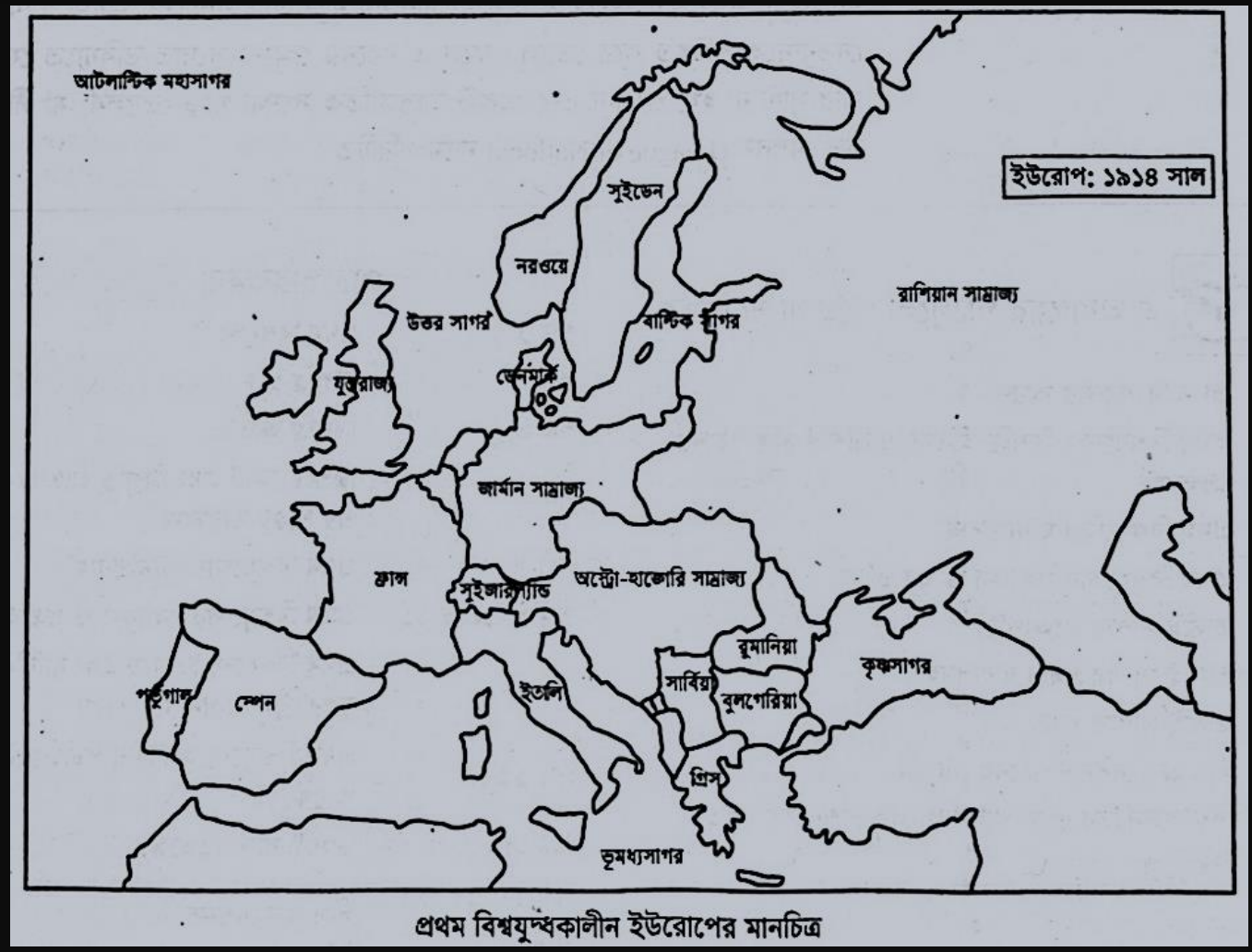

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ইউরোপের মানচিত্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ

ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) পর ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিপ্লবের বিস্তৃতি দুটো পরস্পরবিরোধী প্রবণতা সৃষ্টি করে। একটি পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী শক্তি এবং অপরটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। বিপ্লবের পর ফ্রান্সে বিপ্লবীদের সহিংস কর্মকান্ড এবং এর প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবিপ্লবীদের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সামরিক বিস্ময় নেপোলিয়নের উত্থানে ফ্রান্স এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে (১৮০৩-১৮১৫) বিধ্বস্ত ইউরোপ নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা কংগ্রেসের (১৮১৫) মাধ্যমে ইউরোপীয় শক্তির সমবায় গঠন করে স্থিতাবস্থা আনতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়নের ইউরোপীয় রাষ্ট্র পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় যে প্রবল জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে তা ভিয়েনা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। তারা শক্তির দাপটে ইউরোপকে বিপ্লবপূর্ব অবস্থায় নিয়ে যেতে চান। ইতোমধ্যে ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পবিপ্লব ঘটলে ইউরোপীয় জাতিগুলো সাম্রাজ্যবাদী জাতিতে পরিণত হয়।' এদিক দিয়ে জার্মানি ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়ে। জার্মানিতে শিল্পবিপ্লব ও জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফূরণ ঘটলে তার উপনিবেশের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ উপনিবেশ ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড করায়ত্ত করে ফেললে জার্মানির সাথে এ শক্তিদ্বয়ের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। উপনিবেশ দখল ও উপনিবেশ রক্ষাকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হলে এর চূড়ান্ত পরিণতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

প্রত্যক্ষ কারণ

অস্ট্রিয়া 'বার্লিন সন্ধি' (১৮৭৮) ভঙ্গ করে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করলে সার্বিয়া ক্ষুব্ধ হয়। কেননা, এ দুটি অঞ্চলে সার্ব জাতির অনেক মানুষ বসবাস করত। অস্ট্রো-সার্ব বিরোধ ক্রমে তীব্র আকার ধারণ করে। এদিকে অস্ট্রিয়া ছিল জার্মান বলয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং সার্বিয়া ছিল ফরাসি ও রুশ বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ড বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে স্ত্রী সোফিয়াসহ ভ্রমণকালে সার্ব আততায়ী দ্বারা নিহত হন। এ হত্যাকান্ডের জন্য অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে সম্পূর্ণ দায়ী করে ২৮ জুলাই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পূর্বোক্ত চুক্তি অনুযায়ী জার্মানি এতে সমর্থন জানায়। এদিকে ফ্রান্স ও রাশিয়া সার্বিয়াকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। ক্রমে ইউরোপের অন্য রাষ্ট্রগুলো এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তা বিশ্বযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

পরোক্ষ কারণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ বহুবিধ। এ যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে পূর্ববর্তী একশত বছর ধরে। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে ফরাসি বিপ্লবের প্রতি অপরাপর ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের প্রতিক্রিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীজ বপন করে। নিচে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণগুলো আলোচনা করা হলো:

ভিয়েনা কংগ্রেস (১৮১৫)-এর ত্রুটি (Defects of the Congress of Vienna 1815): ফরাসি বিপ্লবের পর নেপোলিয়ন একের পর এক ইউরোপীয় রাষ্ট্র দখল করার মাধ্যমে সেখানকার স্বৈরাচারী রাজবংশগুলোকে উৎখাত করে প্রজাবান্ধব সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহুধা বিভক্ত জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং বেলজিয়াম, ইতালি, অস্ট্রিয়া পুনর্গঠন করেন। ১৮১৫ সালে ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের কাছে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলে সেই বছর অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস বিজয়ী দেশের শাসকবর্গ বিশেষ করে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া ইউরোপকে নেপোলিয়ন পূর্ব অবস্থায় নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তারা জাতীয়তাবাদী সরকারগুলোকে উৎখাত করে পূর্বেকার রাজবংশগুলোকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বিপ্লবের প্রধান অবদান গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করায় রাষ্ট্রসমূহ ভাগবাটোয়ারা করায় এ ব্যবস্থা বেশিদিন টেকেনি। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ফ্রান্স ও জার্মানিতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থান ঘটে এবং তারা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে অতি দ্রুত আবির্ভূত হয়ে ইউরোপে শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

পরোক্ষ কারণ

উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান (Rise of Extreme Nationalism): উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে জার্মান দার্শনিক, পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদগণ একথা প্রচার করতে থাকেন যে, জার্মানরা বিশুদ্ধ আর্য এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি। হেনরিক ভন (Heinrich Von Treitschke), হাউস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন (Houston Stewart Chamberlain), জেনারেল ফ্রেডারিক ভন বানহার্ডি (Friedrich Von Bernhardi) প্রমুখের উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারণা জার্মানিকে অন্ধ আবেগে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলে। ক্রমে এ জাতীয়তাবাদী ধারণা ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, রাশিয়া ইত্যাদি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইতালি অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে ইতালিয়ানভাষী অঞ্চলগুলো উদ্ধারের উদ্যোগ নিলে বলকান সংকট তীব্র হয়। এমনকি এশিয়ায় জাপান জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করে। ইউরোপের সর্বত্র মারণাস্ত্রের উৎপাদন ও মজুদের হিড়িক পড়ে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার জাতিগত বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় যা তাদের যুদ্ধের দিকে ধাবিত করে। পত্র-পত্রিকাগুলো এ উন্মাদনা সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

পরোক্ষ কারণ

বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের প্রতিযোগিতা (Competition for Colonial and Commercial Expansion): আঠারো শতকে ইউরোপে শুরু হওয়া শিল্পবিপ্লব উনিশ শতকে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। এর ফলে শিল্পসমৃদ্ধ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো তাদের বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উপনিবেশ বিস্তারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এর ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তুলনামূলকভাবে আগে শিল্পসমৃদ্ধ হওয়ায় তারা বিশ্বের বিভিন্ন উপনিবেশ দখল' করে বসে। জার্মানি, রাশিয়া, ইত্যাদি দেশ দেরিতে শিল্পায়িত হওয়ায় উপনিবেশ বিস্তারে পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু এসব দেশের বুর্জোয়া ও পুঁজিপতিশ্রেণি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য স্ব স্ব দেশের সরকারকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। ফলে উপনিবেশ লাভের জন্য একসময় তারাও মরিয়া হয়ে ওঠে এবং শুরু হয় নিরাপত্তা সংকট। এরূপ পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ উপনিবেশ রক্ষা ও নিজ নিজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জার্মানির কোনো কোনো দার্শনিক এই মত প্রচার করেন যে, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড পৃথিবীর ভালো ভালো উপনিবেশগুলো দখল করে ফেললে তারা অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে এমন বলীয়ান হয়ে উঠবে যে জার্মানি একসময় দ্বিতীয় শ্রেণির রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এই ভীতিবোধ থেকে জার্মানির শাসকদের ধারণা হয় যে, ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে - উত্থানের বিকল্প নেই। আর একমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই তা সম্ভব বলে তারা জার্মানিকে একটি যোদ্ধাজাতিতে পরিণত করা ও তার মিত্রশক্তি বৃদ্ধি করার দিকে দৃষ্টি দেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

পরোক্ষ কারণ

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্রনীতি" (Foreign Policy of Kaiser William II): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে অনেকে বিশেষ করে ত্রিশক্তি আঁতাত, জার্মানির চ্যান্সেলর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্রনীতিকে দায়ী করেছেন। তাদের মতে, কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম বিসমার্ক অনুসৃত সাবধান নীতি পরিত্যাগ করে বিশ্ব রাজনীতিতে উপনিবেশ দখল ও নৌ-নির্মাণ নীতিতে ঝুঁকে পড়লে ইউরোপের শক্তিসাম্য বিনষ্ট হয়। তিনি রাশিয়ার সাথে রি-ইস্যুরেন্স (Reinsurance Treaty 1887) চুক্তি বাতিল করলে ১৮৯৩ সালে ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে ফ্রান্স আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার মিত্রহীনতার বদনাম ঘুচিয়ে ফেলে। জার্মানির মিত্রতা লাভের জন্য ইংল্যান্ড চেষ্টা করলেও কাইজার তাতে সাড়া দেননি। ফলে ইঙ্গ-রুশ আঁতাত গড়ে ওঠে। এভাবে কাইজারের ভ্রান্তনীতির ফলে জার্মানির প্রতিপক্ষ শক্তিগুলো একে একে ঐক্যবদ্ধ হয়। এ ঐক্যবদ্ধ শক্তিজোট জার্মান জোটকে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

পরোক্ষ কারণ

বিসমার্কের কূটনীতি (The Diplomacy of Bismarck):

জার্মান চ্যান্সেলর বিসমার্ক-এর উদ্ভাবিত কূটনৈতিক ও সামরিক মৈত্রী চুক্তি নীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। বিসমার্ক অস্ট্রিয়া ও ইতালির সাথে ত্রিশক্তি চুক্তি (Triple Alliance) 'সম্পাদন করলে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও রাশিয়া পরস্পর দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ত্রিশক্তি (Triple Entente) আঁতাত করে। এর ফলে ইউরোপ স্পষ্টত দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

পরোক্ষ কারণ

আন্তর্জাতিক সংকট (International Crisis): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার কতিপয় আন্তর্জাতিক সংকট দ্বিধাবিভক্ত ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার বিদ্বেষ উস্কে দেয়। এগুলোর মধ্যে ছিল ১৯০৮ সালে বার্লিন চুক্তি লঙ্ঘন করে অস্ট্রিয়ার বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল এবং জার্মানির সমর্থন দান, ১৯১১ সালে মরক্কোর আগাদী সংকট, ত্রিপলি দখলের জন্য ইতালির ঘোষণা, ১৯১২-১৩ সালের বলকান সংকট ইত্যাদি ঘটনা। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষই আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও চুক্তিসমূহ লঙ্ঘন করে ঔদ্ধত্য দেখায়। ফলে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অব নেশনস

টপিক – ০২ ত্রিশক্তি চুক্তি

টপিক ০২: ত্রিশক্তি চুক্তি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ত্রিশক্তি চুক্তি

১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের পর পরাক্রমশালী শক্তি হিসেবে জার্মানির উত্থান ঘটে। এ যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানির সীমানা বিস্তৃত হয় এবং জার্মানি তার খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ আলসাস ও লোরেন অঞ্চল ফিরে পায়। এতে জার্মানিতে শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব সংঘটিত হয়। বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানি ঐক্যবদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হলে জার্মানি ক্রমেই ইউরোপে একটি প্রধান শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এজন্য জার্মানির প্রয়োজন ছিল ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে রাখা। কেননা ফ্রান্সই ছিল তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। এজন্য ১৮৭৩ সালে জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও রাশিয়ার তিনজন সম্রাট একটি জোট গঠন করেন, যা ইতিহাসে 'ত্রি-সম্রাট লীগ' (Three Emperors League) নামে পরিচিত। এ জোটের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের বিপ্লবী চেতনা থেকে তাদের রাজতন্ত্রগুলোকে রক্ষা করা। বিসমার্ক এজন্য তার পররাষ্ট্রনীতিতে সাবধানতার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, 'আমি উপনিবেশবাদী নই' (I am not colony man) ।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম

ত্রিশক্তি চুক্তি

পটভূমি

তিনি আরও বলেন, জার্মানি পরিতৃপ্ত দেশ। জার্মানির সম্প্রসারণের প্রয়োজন নেই। তবে তিনি জার্মানিকে নিরাপদে রাখতে আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য ১৮৭৯ সালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সাথে দ্বৈতচুক্তি (Dual Alliance) করেন। আবার ১৮৮১ সালে ফ্রান্স তিউনিসিয়া দখল করলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইতালিকে ব্যবহার করার সম্ভাবনা দেখে বিসমার্ক ১৮৮২ সালে জার্মানি-ইতালি দ্বৈতচুক্তি করেন। এর ফলে জার্মানি, অস্ট্রো-হাজোরি ও ইতালি 'ত্রিশক্তি মৈত্রী' (Triple Alliance) গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে ১৮৮৩ সালে তুরস্ক, রুমানিয়া এবং পরে বুলগেরিয়া এ ত্রিশক্তি জোটে যোগ দেয়। তবে এ ত্রিশক্তি চুক্তিগুলোতে শুধু আত্মরক্ষামূলক মৈত্রীর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বিসমার্কের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে রাশিয়া থেকে পৃথক করে রাখা। এজন্য তিনি ১৮৮৪ সালে 'ত্রি-সম্রাট' চুক্তি নবায়ন করেন। এমনকি বুলগেরিয়া সংকটকে কেন্দ্র করে ত্রি-সম্রাট জোটে ভাঙন ধরলে বিসমার্ক গোপনে রাশিয়ার সাথে ১৮৮৭সালে রি-ইন্স্যুরেন্স সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এভাবে বিসমার্ক একদিকে ত্রি-শক্তি জোট গঠন করে নিজেকে শক্তিশালী করে তোলেন, অপরদিকে রাশিয়াকে ফ্রান্স থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন। বিসমার্ক যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন এ ত্রিশক্তি মৈত্রী জোটের লক্ষ্য ছিল আত্মরক্ষামূলক এবং তা ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হয়েছিল।

ত্রিশক্তি চুক্তি

পটভূমি

অটো ভন বিসমার্ক

ত্রিশক্তি চুক্তি

পটভূমি

ব্রিটেন এ সময় আফ্রিকায় ফ্রান্সের সাথে এবং মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার সাথে উপনিবেশ নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকায় ইউরোপীয় রাজনীতির এরূপ মেরুকরণে গৌরবময় বিচ্ছিন্নতার (Splendid Isolution) নীতি অনুসরণ করে। এ অবস্থায় ব্রিটেন জার্মানির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৮৯০ সালে বিসমার্কের বিদায় এবং কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে জার্মানি আত্মরক্ষামূলক নীতি থেকে সরে এসে আক্রমণাত্মক নীতির দিকে . ধাবিত হয়। কাইজার অবশ্য ১৮৯০-৯৫ সময়কালে পররাষ্ট্রনীতিতে বিসমার্কীয় নীতি থেকে একেবারে সরে আসেননি। তবে ১৮৯৬ সাল থেকে তিনি তার New Course Policy অনুসরণ করেন। বিসমার্কের পতনের পর জার্মানিতে যে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর প্রবল উত্থান ঘটে তাদের প্রভাবে কাইজার জার্মান সম্প্রসারণবাদের দিকে অগ্রসর হন। কাইজার বলেন, 'বিশ্বের যেদিকে তাকাই, তা হলো হয় ব্রিটিশ নতুবা ফরাসি উপনিবেশ। জার্মানিতো একই সূর্যের নিচে বাস করে।' এসব কারণে ত্রিশক্তি মৈত্রী আর আত্মরক্ষামূলক জোট থাকেনি।

ত্রিশক্তি চুক্তি

পটভূমি

ফলে বিকল্প শক্তি হিসেবে ফ্রান্স-ইংল্যান্ড-রাশিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়। ত্রিশক্তি জোটের সদস্য হলেও ইতালি গোপনে ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তুরস্কের কাছ থেকে বলপূর্বক ত্রিপোলি অধিকার করে নেয়। এদিকে বার্লিন চুক্তি লঙ্ঘন করে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করে অস্ট্রিয়া। এ প্রদেশ দুটিতে সার্বিয়ার 'স্লাভ' জাতির বসবাস ছিল। ফলে সার্বিয়া অস্ট্রিয়ার ওপর ক্ষুব্ধ হলে রাশিয়া তার পক্ষাবলম্বন করে। আবার বলকান অঞ্চলের জাতিগুলো বলকান লীগ গঠন করে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এরপর বলকানের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকারের জন্য বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে লড়াই শুরু হলে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া বুলগেরিয়ার পক্ষ নেয়। রাশিয়া যথারীতি সার্বিয়ার পক্ষাবলম্বন করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিসমার্কের শক্তি সাম্যনীতির কারণে ত্রিশক্তি মৈত্রী জোট যে ভারসাম্য রক্ষা করেছিল, কাইজার উইলিয়ামের আক্রমণাত্মক নীতির কারণে এ মৈত্রী জোট একটি আক্রমণাত্মক সামরিক জোটে পরিণত হয়। ফলে ইংল্যান্ড তার নিরপেক্ষতা নীতি বর্জন করে। 'ত্রিপক্ষীয় আঁতাত' (Triple Entente) নামে পাল্টা সামরিক জোট গড়ে ওঠে।

THANK YOU

ত্রিশক্তি চুক্তি

ত্রিশক্তি আঁতাত

ত্রিশক্তি আঁতাত' (Triple Entente) ছিল ত্রিশক্তি জোট (Triple Alliance)-এর হুমকি মোকাবিলায় গড়ে ওঠা ইউরোপীয় সামরিক জোট। ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যান্ড উদীয়মান পরাশক্তি জার্মানিকে মোকাবিলা করার জন্য এ আঁতাত গড়ে তুলেছিলো। একাধিক দ্বিপক্ষীয় চুক্তির সমন্বয়ে এ আঁতাত গড়ে ওঠে।

রাশিয়ার সাথে অস্ট্রিয়ার শত্রুতামূলক সম্পর্ক ছিল। ১৮৭৯ সালে জার্মানি অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি করলে রাশিয়া ক্ষুব্ধ হয়। ফলে রাশিয়ার সাথে জার্মানির 'ত্রি-সম্রাট লীগ' চুক্তি থাকার পরও জার্মানি গোপনে তার সাথে 'রি-ইন্স্যুরেন্স' চুক্তি করে। এ চুক্তির মাধ্যমে বিসমার্ক রাশিয়াকে ফ্রান্স থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এ চুক্তির গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। তিনি তার বিশ্বস্ত সচিব ফ্রেডারিক হলস্টিনের পরামর্শে রাশিয়ার সাথে 'রি-ইন্স্যুরেন্স' চুক্তি বাতিল করেন। হলস্টিন তাকে বুঝিয়েছিলেন যে, একই সাথে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং রাশিয়ার সাথে 'রি-ইন্স্যুরেন্স' চুক্তি পরস্পরবিরোধী।

ত্রিশক্তি চুক্তি

ত্রিশক্তি আঁতাত

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম রুশবিরোধী কয়েকটি হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। রাশিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন বুলগেরিয়ার সিংহাসনে জার্মান রাজবংশ স্থাপন করা এবং জার্মান সেনাপতি দিয়ে বুলগেরিয়া সেনাদল গঠন করলে রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ১৮৯৭ সালে রাশিয়ায় ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে রুশ মুদ্রার দাম কমতে থাকে ফলে জার সরকার এই সংকট উত্তরণে জার্মানির নিকট ঋণ চান কিন্তু জার্মান কাইজার সেটি প্রত্যাখ্যান করেন। তাছাড়া রাশিয়ায় এ সময় অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা থাকায় হলস্টিন রাশিয়ার তুলনায় অস্ট্রিয়ার বন্ধুত্ব জার্মানির জন্য শ্রেয় মনে করেছিলেন। কিন্তু এর ফল হয় মারাত্মক। রাশিয়া জার্মানি কর্তৃক অপমানিত হয়ে ১৮৯৩ সালে ফ্রান্সের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করে।

ত্রিশক্তি চুক্তি

ত্রিশক্তি আঁতাত

ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি, ১৮৯৩ (Franco-Russian Agreement, 1893)

ফরাসি মন্ত্রী ডেলক্যাসি ফ্রান্সের মিত্রহীনতা দূর করার জন্যে রুশ মিত্রতাকে শ্রেয় বলে মনে করতেন। অন্যদিকে জার সরকারও ফ্রান্সের সাথে মিত্রতা স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করায় ডেলক্যাসি পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তির ফলে একদিকে ফ্রান্সের মিত্রতাহীনতা দূর হয়, অপরদিকে ৩% সুদে ফ্রান্স সরকার বিপুল অঙ্কের ঋণ দিলে রাশিয়া তার সংকটাপন্ন অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়। দুই দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফ্রান্সের নৌবহর. শুভেচ্ছা সফরে রাশিয়ায় আসে। জার নিজে দাঁড়িয়ে এই বহরের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। ইতিহাসবিদ রেনেকারীর মতে, প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের প্রতি রাজতন্ত্রী জারের যে বিদ্বেষ ছিল তা দূর হয়ে যায়। রুশ সরকার ও ফরাসি সরকারের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি (১৮৯১) সম্পাদিত হয়। এই সামরিক চুক্তির ধারাবাহিকতায় জার সরকার ফ্রান্সের সাথে মিত্রতা স্থাপনের জন্য ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি (১৮৯৩) স্বাক্ষর করে।

ত্রিশক্তি চুক্তি

ত্রিশক্তি আঁতাত

এই চুক্তিতে বলা হয় যে, যদি জার্মানি ফ্রান্সকে আক্রমণ করে অথবা জার্মানির সমর্থন নিয়ে ইতালি ফ্রান্সকে আক্রমণ করে তবে রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ করবে। অপরদিকে, যদি জার্মানি রাশিয়াকে আক্রমণ করে, অথবা জার্মান সমর্থন নিয়ে অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে আক্রমণ করে তবে ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ করবে। এ চুক্তিতে আরও বলা হয় যে, ফ্রান্স বা রাশিয়ার কেউ আলাদাভাবে জার্মানির সাথে কোনো শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে পারবে না। এভাবেই সৃষ্টি হয় ফ্রান্স-রাশিয়া মৈত্রী। এই চুক্তির ফলে ইউরোপে জার্মানির বিরুদ্ধে জোট গঠনের সূচনা হয়েছিলো। অন্যদিকে ইউরোপে ফ্রান্সের মিত্রতার অভাব দূর হয়েছিলো।

ত্রিশক্তি চুক্তি

ত্রিশক্তি আঁতাত

ইঙ্গ-ফরাসি চুক্তি, ১৯০৪ (Anglo-French Agreement, 1904)

১৮৯৩ সালের ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তির ফলে রাশিয়ার শত্রু দেশে পরিণত হয় জার্মানি। একদিকে ইঙ্গ-জাপান মিত্রতা অন্যদিকে জাপানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহারের ফলে ব্রিটেন জার্মানিকেও সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে। জার্মানি নিজেকে স্থলশক্তি হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে গড়ে তোলার পর নৌশক্তি অর্জনের দিকে নজর দেয়। শিল্পদ্রব্যের বাজার ও উপনিবেশের ক্ষেত্রে জার্মানির প্রধান বাধা ছিল ইংল্যান্ড। জার্মান নৌ-সেনাপতি কাইজারকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, জার্মানি প্রথম থেকেই সর্বাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ গড়তে সক্ষম। অপরদিকে ইংল্যান্ডকে তার পুরানো জাহাজগুলো ভেঙে নতুনভাবে নির্মাণ করতে হলে সে জার্মানি থেকে পিছিয়ে পড়বে। ১৮৯৬ সালে কাইজার বলেন, 'জার্মানির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সমুদ্রের আধিপত্য লাভের ওপর' (The future of Germany lies on the seas)। জার্মানির নৌ-নির্মাণ নীতির ফলে ইংল্যান্ড আতঙ্কিত বোধ করে। সে জার্মানিকে তার নৌ-নির্মাণ নীতি সংযত করার অনুরোধ করে। ব্রিটিশ নৌ-মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল জার্মানিকে উদ্দেশ্য করে এ বলে আবেদন করেন যে, 'ইংল্যান্ডের পক্ষে নৌ-বহর হলো বাঁচা-মরার প্রশ্ন এবং জার্মানির ক্ষেত্রে নৌ-বহর হলো বিলাসিতা মাত্র'। কিন্তু জার্মান মন্ত্রী ভন বুলো ইংল্যান্ডের এ আবেদনে সাড়া না দিয়ে বলেন, জার্মানি তার হাত খোলা রাখতে চায়। কিন্তু কাইজার সরকারের তীব্র ব্রিটিশ বিরোধীতায় ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রীর সম্ভাবনা নষ্ট হয়।

ত্রিশক্তি চুক্তি

ত্রিশক্তি আঁতাত

ব্রিটেনের মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলে দ্রুত জোটবদ্ধ হওয়া উচিত। ফরাসি মন্ত্রী থিওফিল ডেলক্যাসির তীক্ষ্ম কূটনীতিতে ফ্রান্স ও ব্রিটেন তাদের পূর্বের সকল বিরোধ মিটিয়ে ফেলে ১৯০৪ সালে ইঙ্গ-ফরাসি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে বলা হয়েছিলো যে- ১. মিশরে ব্রিটেনের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় ফ্রান্স বাধা দেবে না। ২. ব্রিটেন মরক্কোয় ফ্রান্সকে বাধা দেবে না। ৩. শ্যাম দেশ, মাদাগাস্কার, নিউ ফাউন্ডল্যান্ড প্রভৃতি স্থানে উভয় দেশ নিজ নিজ কর্তৃত্বের এলাকা স্থির করবে। ৪. ইঙ্গ-ফরাসি সন্ধির গোপন শর্ত উভয় স্বাক্ষরকারীদেশ কার্যকরি করতে মেনে চলতে প্রতিশ্রুতি দেয়। ৫. এই সন্ধিতে ভূমধ্যসাগরে ফরাসি নৌ-বহর এবং ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সমুদ্রে ব্রিটিশ নৌ-বহর দ্বারা জার্মানির বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এই চুক্তির ফলে ইঙ্গ-ফরাসি মিত্রতা আরও ঘনিষ্ঠ হয়। এ কারণে এই সন্ধিকে 'আঁতাত কর্ডিয়াল' (Entente Cordiale) বলা হয়। এই সন্ধির গুরুত্ব এখানে নিহিত যে, ইঙ্গ-ফরাসি চুক্তির দ্বারা ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে পরস্পরের স্বার্থরক্ষায় 'জোটবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়।

ত্রিশক্তি চুক্তি

ত্রিশক্তি আঁতাত

ইঙ্গ-রুশ চুক্তি, ১৯০৭ (Anglo-Russian Agreement, 1907)

রাশিয়ার মন্ত্রী কারকফ (Karkoff) জার তৃতীয় আলেকজান্ডারকে বোঝান যে, 'রাশিয়ার কাঁধে চড়ে জার্মানি আজ এত বড় হয়েছে। অকৃতজ্ঞ জার্মানি এখন রাশিয়াকে পরিত্যাগ করেছে।' রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-০৫) রাশিয়ার পরাজয়ের পর ব্রিটেনের সাথে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল নিয়ে বিরোধ কমে আসে। রাশিয়ার সাথে ইউরোপের অপরাপর শক্তিশালী রাষ্ট্র জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধের আশংকা বাড়লে ব্রিটেনের মিত্রতার প্রয়োজন হয়। ইউরোপে জার্মানিকে পরাজিত করতে গেলে রুশ মিত্রতা দরকার মনে করেছিলো ব্রিটিশ সরকার। ইঙ্গ-রুশ চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেন ফরাসি মন্ত্রী থিওফিল ডেলক্যাসি। ফলশ্রুতিতে ১৯০৭ সালে রুশমন্ত্রী আইভোলস্কির সাথে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হ্যারল্ড নিকলসনের আলোচনার ফলে 'ইঙ্গ-রুশ চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে-

ত্রিশক্তি চুক্তি

ত্রিশক্তি আঁতাত

১. ইঙ্গ-রুশ উভয় সরকার আফগানিস্তান ও তিব্বতের স্বাধীনতা রক্ষায় সম্মত হয়।

২. পারস্যের ক্ষেত্রে দুই দেশ নিজ নিজ প্রভাবযুক্ত এলাকা স্থির করে নেয়। পারস্যকে তিনটি অংশে ভাগ করে দক্ষিণ পারস্যে ব্রিটিশ প্রভাব এবং উত্তর পারস্যে সিংহল, জর্জিয়া, আজারবাইজান অঞ্চলে রুশ প্রভাব রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মধ্য পারস্যকে নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করা হয়।

ইঙ্গ-রুশ (১৯০৭) চুক্তির ফলে ইউরোপ দুটি শক্তি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে জার্মানির বিরুদ্ধে এভাবে ফ্রাঙ্কো-রুশ, ইঙ্গ-রুশ, ইঙ্গ-ফ্রাঙ্ক দ্বিপাক্ষিক আঁতাতের সমন্বয়ে ইউরোপে ইঙ্গ-ফ্রাঙ্ক-রুশ ত্রি-পক্ষীয় আঁতাত গড়ে ওঠে যাকে 'ত্রিশক্তি আঁতাত' বলা হয়। ত্রিশক্তি আঁতাতের ফলে ইউরোপে শান্তি স্থাপিত না হয়ে উভয় শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়। বিবাদমান শক্তিগুলোর দ্বন্দ্বে ইউরোপে কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অব নেশনস

টপিক – ০৩ ত্রিশক্তি জোট এবং ত্রিশক্তি আঁতাত-এর শক্তির ভারসাম্য

টপিক ০৩: ত্রিশক্তি জোট এবং ত্রিশক্তি আঁতাত-এর শক্তির ভারসাম্য

This Topic is important for

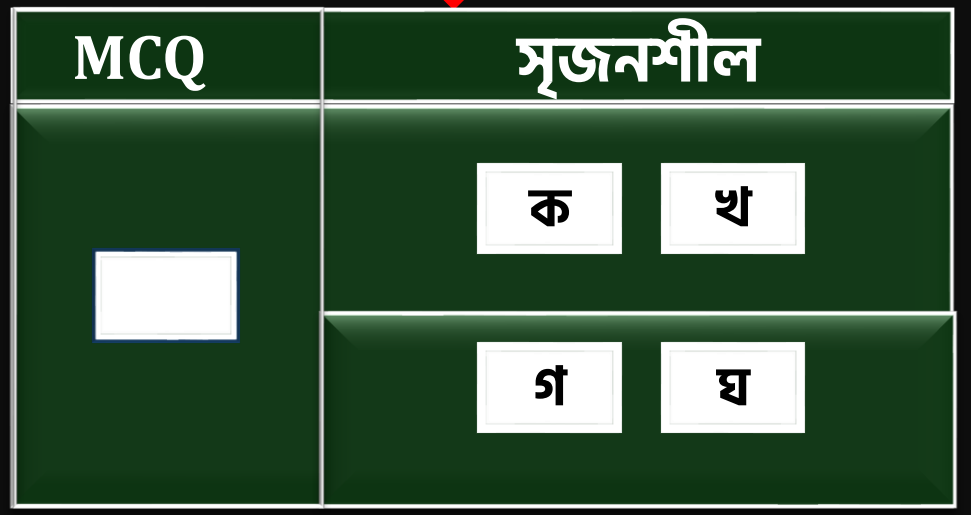

ত্রিশক্তি জোট এবং ত্রিশক্তি আঁতাত-এর শক্তির ভারসাম্য

ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। সরকার ছিল ঋণভারে জর্জরিত। অসম কর ব্যবস্থা, সরকারের অমিতব্যয়িতা, শস্যহানি, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি কারণে দেশটির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে পড়ে ছিল। এ সময় ফ্রান্সে তিন ধরনের প্রত্যক্ষ কর প্রচলিত ছিল- সম্পত্তি কর বা টাইল (Taille), উৎপাদন কর বা ক্যাপিটেশন (Capitation) এবং আয়কর বা ভিংটিয়েম (Vingtieme)। আরও কিছু শুল্ক ছিল, যেমন- লবণ শুল্ক (Gabelle), আবগারি শুল্ক (Excise)। এছাড়া ভূমিদাসদের ওপর সামন্তপ্রভুরা কিছু কর আরোপ করত, যেমন- ফসলের ভাগ বা শামপার্ত (Champart), বাৎসরিক খাজনা বা সেন্স বা সঁস (Cens), ভোগ্যপণ্যের ওপর কর (Aide) ইত্যাদি। গির্জাকে লোকের দিতে হতো ধর্মকর (Tithe), জন্ম নিবন্ধন ও মৃত্যু নিবন্ধন কর।

ত্রিশক্তি জোট এবং ত্রিশক্তি আঁতাত-এর শক্তির ভারসাম্য

১৮৭১ সালের পর থেকে ইংল্যান্ডের নিরপেক্ষ নীতি ও ত্রি-সম্রাট লীগের ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে রাখার নীতির ফলে ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছিল। পরস্পরবিরোধী এই শক্তিজোটের লক্ষ্য ছিলো ইউরোপে শক্তিসাম্য স্থাপন করে শান্তি বজায় রাখা। কিন্তু ত্রিশক্তি জোট এবং ত্রিশক্তি আঁতাত গড়ে ওঠার ফলে ইউরোপে সে শক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। ফলে অদূর ভবিষ্যৎতে একটি সর্বগ্রাসী যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। জার্মানির সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম বিসমার্কের 'সাবধানতার নীতি' পরিত্যাগ করে 'Weltpolitik' নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সেসময় তিনি বুঝতে পারেননি যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া আঁতাত করতে পারে। তিনি মনে করেছিলেন, ঐতিহাসিক কারণেই ইঙ্গ-ফ্রাঙ্ক জোট সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তবে যখন এ আঁতাত গড়ে ওঠে তখন তিনি ত্রিশক্তি আঁতাত বিনষ্ট করার জন্য ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

ত্রিশক্তি জোট এবং ত্রিশক্তি আঁতাত-এর শক্তির ভারসাম্য

ইউরোপে জার্মানির স্থলশক্তি ও নৌশক্তি এত দ্রুত বাড়ছিলো যে, তার সঙ্গে সমতা রক্ষার প্রয়োজনে ফ্রান্স ও রাশিয়া জোটবদ্ধ হয় এবং পরবর্তীতে ব্রিটেন যোগ দিলে 'ত্রিশক্তি আঁতাত' গড়ে ওঠে। ত্রিশক্তি জোটের তুলনায় ত্রিশক্তি আঁতাত-এর সামরিক সক্ষমতা ছিল অনেক বেশি। কেননা, ইতালি সে সময় তেমন শক্তিশালী কোনো রাষ্ট্র ছিল না। তাছাড়া ইতালি ত্রিশক্তি জোটে যোগ দিলেও গোপনে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ত্রিপোলি অধিকার করে। ফলে জার্মানিকে একাই লড়তে হয়। অপরদিকে, ত্রিশক্তি আঁতাতের ফ্রান্স ও রাশিয়া ছিল ইউরোপের অন্যতম স্থলশক্তি। এ দু'দেশের মিলিত সৈন্যসংখ্যা জার্মানির সৈন্যসংখ্যা থেকে ছিল অনেক বেশি। তাছাড়া ইংল্যান্ড তখন ছিল নৌশক্তিতে বিশ্বে অদ্বিতীয়। জার্মানি অতি দ্রুত নৌ-শক্তিতে বলীয়ান হতে শুরু করলেও ইংল্যান্ডের সমকক্ষতায় আসতে তার সময়ের প্রয়োজন ছিল।

ত্রিশক্তি জোট এবং ত্রিশক্তি আঁতাত-এর শক্তির ভারসাম্য

১৯০২ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড জার্মানির সাথে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। এ বছর ইঙ্গ-জাপান চুক্তির মাধ্যমে ইংল্যান্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। কেননা জাপান ছিল রাশিয়ার শত্রু দেশ। কিন্তু কাইজারের নৌ-নির্মাণ নীতির কারণে এ সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। অস্ত্র নির্মাণ এবং নৌবাহিনী গঠনের মূলে ছিল প্রতিটি বৃহৎ শক্তির মনে অপর শক্তি সম্পর্কে অবিশ্বাস। জার্মানি নৌশক্তিতে ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে- এ আশঙ্কা থেকেও ব্রিটেন তার নৌশক্তি বাড়িয়ে চলে। ১৯০৩ সাল থেকে ব্রিটেন দ্রুত উত্তর সাগরীয় নৌ-বহর নামে একটি নৌ-বহর নির্মাণ শুরু করে। রাশিয়া সাড়ে তিন বছরের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা চালু করে। জার্মানিও ব্রিটেনের সমকক্ষ হতে দ্রুত নৌশক্তি বাড়াতে থাকে ফলে নৌ নির্মাণ প্রতিযোগিতায় দুই পরাশক্তি লিপ্ত হয়। জার্মানিকে মোকাবিলার জন্য ইংল্যান্ড তার চিরশত্রু ফ্রান্স ও কৌশলগত শত্রু রাশিয়ার সাথে ঔপনিবেশিক বিরোধ মিটিয়ে ফেলে। এদিকে ফরাসি মন্ত্রী থিওফিল ডেলক্যাসি (Theophile Delcasse) ভেবে দেখেন যে, রাশিয়ার সাথে ইংল্যান্ডের বিরোধের বিষয়গুলো হলো গুরুত্বহীন। প্রকৃতপক্ষে জার্মানির সাথে ফ্রান্সের বিরোধের বিষয়গুলোই মৌলিক। তাই ফ্রান্স ইংল্যান্ডের সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার সুযোগ গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরে ফরাসি নৌবহর এবং ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সমুদ্রে ব্রিটিশ নৌবহর স্থাপনের মাধ্যমে জার্মানির বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধের আশংকা ও ভীতির কারণে নৌশক্তি বৃদ্ধি ও মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করে।

ত্রিশক্তি জোট এবং ত্রিশক্তি আঁতাত-এর শক্তির ভারসাম্য

মরক্কো সংকটকে কেন্দ্র করে ইউরোপ অনিবার্যভাবে বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত হতে থাকে। ১৮৯৩ সালে ফ্রাঙ্কো-রুশ-আঁতাত ও ১৯০৪ সালে ইঙ্গ-ফরাসি আঁতাতের ফলে জার্মানির কাইজার সরকারের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি মরক্কোকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। কাইজার সরকার ইঙ্গ-ফরাসি জোটের আঁতাত কতটা মজবুত তা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন। মরক্কোয় ফরাসি প্রভাব খর্ব করতে কাইজারের প্রচেষ্টায় ফ্রান্স যুদ্ধের ভয় পেতে থাকে। ইংল্যান্ড ফ্রান্সকে পূর্ণ সমর্থন দিলে ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানায়। জার্মানিও এসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। পরবর্তীতে আলজেরিয়ার্স সম্মেলনে (১৯০৬) মরক্কো সংকটের অবসান হয়। জার্মান কাইজার মরক্কোয় ফরাসি আধিপত্য মেনে নেন। অন্যদিকে বলকান অঞ্চলে তুরস্কের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। 'বলকান সংকট'কে কেন্দ্র করে ইউরোপের দুই পরস্পরবিরোধী জোট মুখোমুখি হয়। ভয়াবহ যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় ইউরোপ। তুরস্কের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী জোটগুলো বলকান লীগ গঠন করে বলকান যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তুরস্ক বলকান যুদ্ধে পরাজয় বরণ করলে বলকানের বিভিন্ন অঞ্চল দখলের জন্য বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হয়।

ত্রিশক্তি জোট এবং ত্রিশক্তি আঁতাত-এর শক্তির ভারসাম্য

এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া বুলগেরিয়ার এবং রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ নিলে ইউরোপের বৃহৎশক্তিগুলো বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা নিয়ে অস্ট্রো-সার্বিয়া দ্বন্দ্ব চরমে উঠে। এসময় অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ও তার পত্নী সারায়েভোতে উগ্রপন্থী দ্বারা নিহত হলে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে চরমপত্র পেশ করে। জার্মান সম্রাট কাইজার উইলিয়ামের এশিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি ১৯১৪ সালের ১৮ জুলাই জার্মান সামরিক-অসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এক গোপন নোটের মাধ্যমে জানান, অস্ট্রিয়ার সাথে সার্বিয়ার যুদ্ধ আসন্ন। সার্বিয়ার পেছনে আছে রাশিয়া। এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় হলে জার্মানির দারুণ ক্ষতি হবে। সুতরাং জার্মানির সব কর্মচারী এ কথা স্মরণ রেখে যেন প্রস্তুত থাকে। এই চরমপত্রের দাবিগুলো সার্বিয়ার নিকট অগ্রাহ্য হলে অস্ট্রিয়া জার্মানির প্ররোচণায়
সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত করে।

ত্রিশক্তি জোট এবং ত্রিশক্তি আঁতাত-এর শক্তির ভারসাম্য

ইউরোপে পরস্পরবিরোধী জোট গঠন ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির কারণে সমগ্র ইউরোপ সামরিক ছাউনির মধ্যে বসবাস করে। বৃহৎ শক্তির তীব্র সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা শক্তির ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। ১৮৭১-১৯১৪ সময়কালের মধ্যে ইউরোপ বড় কোন ধরনের যুদ্ধ দেখেনি। বৃহৎ শক্তিগুলোও ছোটখাট কারণে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি। ১৯০৪-১৯১৪ পর্যন্ত এক দশক ইউরোপীয় ইতিহাসকে বলা হয় 'সশস্ত্র শান্তির যুগ' বা 'Age of Armed Peace'। ইতিহাসবিদ ডেভিড থমসন এই যুগকে 'আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যের যুগ' বলেও অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পরস্পরবিরোধী প্রত্যেক জোটের যতবেশি সম্ভব মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা শুরু হলে একটি সর্বগ্রাসী যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ত্রিশক্তি আঁতাত এবং ত্রিশক্তি জোটের মধ্যে অস্ট্রিয়া-সার্বিয়াকে কেন্দ্র করে ইউরোপজুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কামান গর্জে ওঠে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অব নেশনস

টপিক – ০৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

টপিক ০৪: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

This Topic is important for

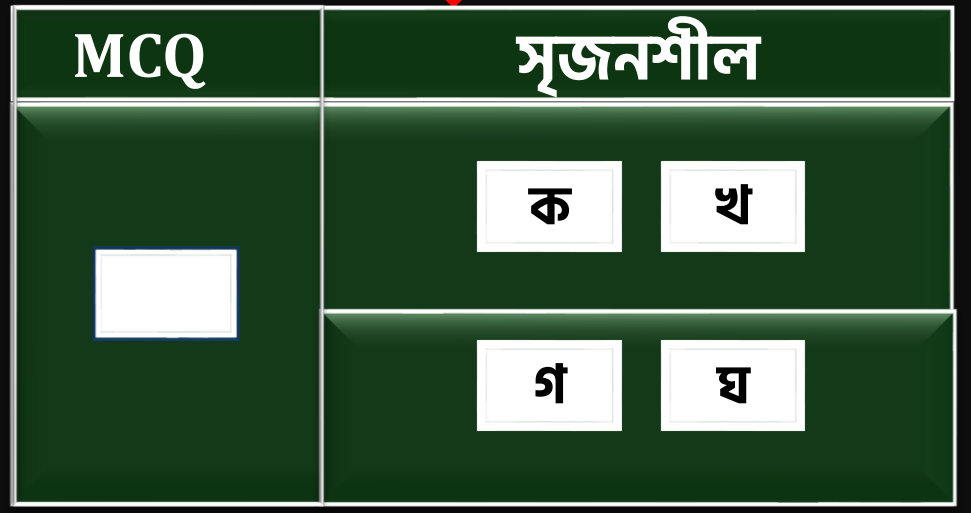

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জলে ও স্থলে সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছিল। যুদ্ধটি পরিকল্পিতভাবে শুরু হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে দুই সামরিক শিবিরে বিভক্ত ইউরোপের প্রায় সবগুলো রাষ্ট্র আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কায় প্রস্তুত হয়ে ছিল। অবশেষে অস্ট্রিয় যুবরাজের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বেঁধে যায়।

এই মহাযুদ্ধ ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই থেকে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত চার বছর তিন মাস তেরো দিন স্থায়ী হয়েছিল (যুদ্ধবিরতি পর্যন্ত)। এতে একদিকে ছিল ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও সার্বিয়া; অপরপক্ষে ছিল জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরি। ইতালি ও রুমানিয়া জার্মানির পক্ষে থাকার কথা থাকলেও তারা নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। তবে শেষ পর্যন্ত প্রায় কেউই নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি। তিনটি মহাদেশের ৩৪টি দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

সূত্রপাত

১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনান্ড ও তার স্ত্রী সোফিয়া বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে প্রকাশ্য দিবালোকে সার্ব আততায়ী গ্যাব্রিলো প্রিন্সেপের (Gavrilo Princip) গুলিতে নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ড অস্ট্রিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অস্ট্রিয়া সার্বিয়া সরকারকে এ জন্য দায়ী করে। অস্ট্রিয়া ২৩ জুলাই উক্ত চরমপত্রটি সার্বিয়া সরকারের কাছে প্রেরণ করে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দাবিগুলো বাস্তবায়নের জন্য চাপ দেয়। সার্বিয়া কয়েকটি দাবি পূরণ করে এবং বাকি কয়েকটি দাবির সাথে তার সার্বভৌমত্বের বিষয়টি জড়িত থাকায় তার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব দেয়। জার্মানি অস্ট্রিয়াকে সমর্থন দেয়। ফলে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ২৮ জুলাই সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড আক্রমণ করে দখল করে নেয়। এভাবে প্রথম যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

যুদ্ধের বিস্তার

১৯১৪ সালের ২৩ জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে চরমপত্র প্রদান করলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালি মধ্যস্থতার চেষ্টা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে জার্মানির ভূমিকা ছিল সন্দেহজনক। মনে করা হয়, জার্মানি মধ্যস্থতার বদলে অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে। ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে রাশিয়া তার পশ্চিম সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে। জার্মানি ৩১ জুলাই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার জন্য রাশিয়াকে চরমপত্র প্রদান করে। রাশিয়া এর কোনো জবাব না দিলে ১ আগস্ট জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করে। একইভাবে ৩ আগস্ট জার্মানি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এদিকে ২৪ আগস্ট তুর্কি সরকার জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা দেয়। জার্মানি বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করায় ৪ আগস্ট ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের শুরুতেই জার্মানি শ্লিফেন পরিকল্পনা (Schlieffen Plan) অনুযায়ী পশ্চিম রণাঙ্গনে নিরপেক্ষ দেশ বেলজিয়াম আক্রমণ ও দখল করে নেয়। বেলজিয়াম লিজ ও নামুর নামক স্থানে অসীম বীরত্বের সাথে লড়াই করেও জার্মান বাহিনীকে রুখতে ব্যর্থ হয়। ফলে জার্মান সৈন্যরা রাইন সীমান্ত ও বেলজিয়ামের ভেতর দিয়ে ফ্রান্সে ঢুকে রাজধানী প্যারিসের ১৫ মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায়। এরপর ফরাসি বাহিনী সেনাপতি জোসেফ জোফ্রির (Joseph Joffre) নেতৃত্বে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

যুদ্ধের বিস্তার

তারা প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য লড়াই করে জার্মান বাহিনীকে ফরাসি সীমান্তের বাইরে পাঠিয়ে দেয় এবং প্যারিস রক্ষা পায়। এর ফলে ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী জার্মান বাহিনীর সাথে লড়াইয়ের প্রস্তুতির সময় পায়। এর জার্মান বাহিনী এইসনি নদীর (Aisne River) তীরে শিবির স্থাপন করে। সেখানে উভয়পক্ষের মধ্যে দীর্ঘকাল পরিখা যুদ্ধ চলে। ইতোমধ্যে রাশিয়া ট্যানেনবার্গের যুদ্ধে (Battle of Tannenberg) পরাজিত হয়ে অস্ট্রিয়ার রাজ্যসীমা ত্যাগ করলে জার্মানি সমগ্র বেলজিয়াম দখল করে নেয়।

এ সময় ব্রিটেনের ট্যাংকবাহিনী যুদ্ধরত ফরাসিদের সাথে যোগদান করে। এ বাহিনী ভার্দুনের যুদ্ধে জার্মান বাহিনীকে হটিয়ে দেয়। জার্মান বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাতে থাকে। তারা সোমের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের বহু ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

যুদ্ধের বিস্তার

পশ্চিম রণাঙ্গনে মার্নের প্রথম যুদ্ধের (৬-১২ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪) পর জার্মান বাহিনী ও ইঙ্গ-ফ্রাঙ্ক বাহিনী একে অপরকে আক্রমণের চেষ্টা করে সফল হয়নি। এ সময় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে কোনো পক্ষই তাদের যুদ্ধ কৌশল কার্যকর করতে পারেনি। ইঙ্গ-ফ্রাঙ্ক বাহিনী আলসাস-লোরেন অঞ্চলে জার্মান তৎপরতা নেই দেখে সেদিক দিয়ে জার্মানিতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে; কিন্তু সেখানে জার্মান সৈন্যরা খুবই মজবুত পরিখা খনন করে অবস্থান নেওয়ায় তারা সফল হয়নি। ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত জার্মান বাহিনী ভার্দুনে অনবরত আক্রমণ চালিয়ে ফরাসি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হলেও সফলতা লাভ করতে পারেনি। ভার্দুনে উভয়পক্ষের ৭,০০,০০০ থেকে ৯,৭৫,০০০ সৈন্যের জীবন বিপন্ন হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

যুদ্ধের বিস্তার

এদিকে সোমের যুদ্ধে (Battle of Somme) মিত্রশক্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ফ্রন্টে ১ জুলাই ১৯১৬ তারিখে একদিনেই প্রায় ৫৭,০০০ জন ব্রিটিশ সেনা আহত হয় যার মধ্যে ১৯,২৪০ জন মৃত্যুবরণ করে। সোমের যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর ৪,২০,০০০ এবং ফরাসি বাহিনীর ২,০০,০০০ সৈন্য হতাহত হয়। অপরদিকে, জার্মান বাহিনীর ৪,৬৫,০০০ সৈন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভার্দুনে ও সোমে রক্তাক্ত প্রতিরোধ যুদ্ধে অগণিত সৈন্য ক্ষয়ের ফলে ফরাসি সেনাবাহিনী ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়। অতঃপর ১৯১৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে নেভিলে জার্মান বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে ইঙ্গ-ফ্রাঙ্ক বাহিনী ব্যর্থ হলে ফরাসি সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এদিকে এরাসে (Arras) ব্রিটিশ বাহিনী ও ভিমি রিজে (Vimy Ridge) কানাডিয়ান বাহিনী সামান্য সফল হলেও পশ্চিম প্রান্তের লড়াইয়ে তা তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। ১৯১৭ এর জুলাই-নভেম্বরে বেলজিয়ামের পাশেনডেল (Passchendaele) এ ব্রিটিশ বাহিনী জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে এক বড় আক্রমণ রচনা করে। এখানে মিত্র পক্ষের জয়লাভের সম্ভাবনা একপর্যায়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে এ যুদ্ধে উভয়পক্ষে দুই থেকে চার লাখ সৈন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পশ্চিম প্রান্তে ইঙ্গ-ফরাসি ও জার্মান বাহিনী পরিখা খনন করে যে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাতে উভয়পক্ষের ব্যাপক লোকক্ষয় হলেও কেউ সফলতা লাভ করতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ ছিল রণকৌশলের সীমাবদ্ধতা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

নৌযুদ্ধ

যুদ্ধের শুরুতে জার্মান ক্রুজারগুলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মোতায়েন ছিল। এগুলো বিচ্ছিন্নভাবে মিত্রপক্ষের বাণিজ্য জাহাজগুলোকে আক্রমণ করত। কিন্তু ব্রিটেনের দক্ষ নৌবাহিনী পদ্ধতিগতভাবে একে একে জার্মানির ক্রুজারগুলোকে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করতে শুরু করে।

যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়ে গেলে ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ আরোপ করে। এর মাধ্যমে ব্রিটেন জার্মান কুজারগুলোর অবাধ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে জার্মানি ডুবোজাহাজের মাধ্যমে ব্রিটিশ নেভির ক্ষতি করতে সচেষ্ট হয়। 'ইউবোট' নামে পরিচিত জার্মানির ডুবোজাহাজগুলো ছিল সাগরে মিত্রপক্ষের জাহাজের জন্য আতঙ্ক। ১৯১৬ সালের ৩১ মে থেকে ১ জুন উত্তর সাগরে জার্মান নেভি ও ব্রিটিশ নেভির মধ্যে ইতিহাসের সর্ববৃহৎ নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যদিও এ যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং জার্মান নৌবাহিনী সফলভাবে ব্রিটিশ আক্রমণ মোকাবিলা করে। তবে উত্তর সাগরের ওপর ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় থাকে। জার্মান ইউ-বোটগুলো উত্তর আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যকার সরবরাহ লাইনগুলো অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে অকেজো করতে চেষ্টা করে। এর ফল হয় উল্টো। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামুদ্রিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সে নিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করে মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। জার্মান ইউবোটগুলো ১৯৯টি সাবমেরিনের মাধ্যমে মিত্রপক্ষের ৫০০০ জাহাজ ধ্বংস করতে সমর্থ হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

নৌযুদ্ধ

এদিকে জার্মানির মিত্র তুরস্ক দার্দানেলিস প্রণালির ভেতর দিয়ে মিত্রপক্ষের জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয়। মিত্রপক্ষ গ্যালিপলি (Gallipoli) আক্রমণ করলে তুরস্কের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে।

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনী তুর্কি বাহিনীর বিরুদ্ধে 'কুৎ-এল আমারা'র যুদ্ধে পরাজিত হয়। তবে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বাহিনী বাগদাদ দখল করতে সমর্থ হয়। পূর্ব রণাঙ্গনে, প্রথমদিকে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী জার্মানির গ্যালিসিয়া প্রদেশে ঢুকে পড়ে। কিন্তু দুর্ধর্ষ জার্মান সেনাপতি হিন্ডেনবার্গের (Paul von Hindenburg) সহকারী সামরিক কর্মকর্তা লুডেনডর্ফ (Erich Ludendorff) রুশ সেনাদের জার্মানি থেকে বিতাড়ন করেন। ট্যানেনবার্গ ও অগাস্টোভোর যুদ্ধে রুশদের প্রচুর ক্ষতি হয়। ১৯১৫ সালে হিন্ডেনবার্গ রাশিয়ার ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া দখল করে নেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

নৌযুদ্ধ

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের ফলে সোভিয়েত সরকার জার্মানির সাথে ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধির (Treaty of Brest-Litovsk) মাধ্যমে যুদ্ধ ত্যাগ করলে পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী বিশেষ সংকটে পড়ে। ইতিপূর্বে অস্ট্রিয়া ইতালি আক্রমণ করে। উভয়পক্ষে কিছু দিন যুদ্ধের পর জয়-পরাজয় অমীমাংসিত অবস্থায় ছিল। রাশিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করলে পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে জার্মান বাহিনী তার পূর্ব রণাঙ্গনের সেনাদের পশ্চিম রণাঙ্গনে সরিয়ে এনে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম আক্রমণ করে। ফলে মিত্রপক্ষের পরাজয়ের আশঙ্কা দেখা দেয়। ঠিক এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষে যোগদান করলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। কেননা সম্পদশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় মিত্রপক্ষ নতুন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করে।

দীর্ঘকাল এক নাগাড়ে যুদ্ধ চলায় জার্মানির শক্তি ক্রমেই ক্ষয় পেতে থাকে। মিত্রশক্তির অনবরত হামলায় জার্মান সৈন্যদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে। অস্ট্রিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক ইত্যাদি রাষ্ট্রকে জার্মানির একার পক্ষে দীর্ঘকাল সহায়তাদান করা সম্ভব ছিল না। এরূপ পরিস্থিতিতে, জার্মানিতে গণতান্ত্রিক দল সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা কাইজার উইলিয়ামের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে কাইজার দেশ থেকে পালিয়ে যান। ফলে জার্মানিতে একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। এ সরকার ১৯১৮ সালের নভেম্বরে নতি স্বীকার করে মিত্রশক্তির সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অব নেশনস

টপিক – ০৫ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব

টপিক ০৫: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এ যুদ্ধ বিশ্বের জনসংখ্যা ও মানচিত্রের বিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশ্বে নতুন মেরুকরণ ঘটে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মানুষের ধ্যান-ধারণা বদলে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব

প্রত্যক্ষ ফল (Direct Result)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তি হিসেবে পরিচিত জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি মিত্রশক্তির কাছে পরাজিত হয়। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর জার্মানি নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে ফ্রান্স, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৯১৯ সালের ২৮ জুন জার্মানি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে পরাজিত দেশ হিসেবে সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও পোল্যান্ডকে তাদের প্রাপ্য অঞ্চল ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। জার্মানির উপনিবেশগুলো ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম ভাগ করে নেয়। জার্মানিকে ১৩২ বিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়। এর ৫২% ইংল্যান্ড, ২২% ফ্রান্স, ১০% ইতালি এবং বাকি অংশ অন্য মিত্রপক্ষীয় দেশগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হয়। জার্মানির সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়া হয় এবং মানচিত্র পরিবর্তন করে ফেলা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব

জার্মানি ও রাশিয়ায় সরকার পরিবর্তন (The Change of Government in Germany and Russia)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মানি ও রাশিয়ায় সরকারের পতন ঘটে। জার্মানিতে গণতান্ত্রিক দল কাইজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে হল্যান্ডে পলায়ন করতে বাধ্য করে। অপরদিকে জারের একনায়কত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রুশ জনগণ বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

উপনিবেশগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলন (Liberation Movement in Colonies)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির দুর্ধর্ষ আক্রমণে ব্রিটিশ শক্তি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে ব্রিটেন নিয়ন্ত্রিত উপনিবেশগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯২০ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর (মহাত্মা গান্ধী) নেতৃত্বে ভারতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ভারতের এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব

রাজতন্ত্রের অবসান (Collapse of Monarchism)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও তুরস্কে রাজতন্ত্রের অবসান হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ১৬টি দেশ নিজেদের দেশকে প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। অবশ্য কোনো কোনো দেশে প্রজাতন্ত্র সফল না হওয়ায় শেষে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন জার্মানিতে প্রজাতন্ত্র ব্যর্থ হলে একনায়ক হিটলারের উত্থান ঘটে। ইতালিতে অনুরূপভাবে মুসোলিনীর উত্থান ঘটে।

ব্রিটেনের মর্যাদা বৃদ্ধি (Rise of Britain's Prestige)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়ে বিপুল ক্ষতির শিকার হলেও ব্রিটেন জয়লাভের ফলে অনন্যসাধারণ মর্যাদার অধিকারী হয়। ব্রিটেনের নৌবাহিনীর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বহুলভাবে প্রমাণিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব

নতুন অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান (Rise of the USA as a New Economic Power)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিপুল পরিমাণ সামরিক রসদপত্র বিক্রি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপকভাবে লাভবান হয়। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র ঋণগ্রস্ত দেশ থেকে সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়। যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের পুঁজিবাজার নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত হলে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক পুঁজিবিনিয়োগের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় রাজনীতিতে সফলভাবে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়।

সাধারণ ফলাফল (General Results)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের প্রতিটি দেশের জনজীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে প্রভাব ফেলেনি। অগণিত লোকের মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব বরণ এবং ধন-সম্পদের ক্ষয় ছিল এর সাধারণ ফলাফল। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রায় ৭ কোটি লোকের মধ্যে এক কোটি ২০ লক্ষ লোক শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারায়। সাধারণ লোকের অর্থ ও সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ ছিল ভয়াবহ। উৎপাদন হ্রাস, বেকারত্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্য দেখা দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব

নৈতিক অবক্ষয় (Moral Degradation)

যুদ্ধের ফলে মানুষের ব্যাপক নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। যুদ্ধের সময় বিবদমান পক্ষগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যাপক মিথ্যা প্রচার চালায়। শত্রুর ক্ষতিকে বড় করে দেখানো এবং নিজেদের ক্ষতিকে ছোট করে দেখানো প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। যা কিছু অন্যায় তার জন্য দায়ী শত্রুপক্ষ- এ ধরনের ধারণা বিকশিত হওয়ায় মানুষের মননশীলতার বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হয়। সরকারি স্তরে মিথ্যাচার মানুষের নীতিবোধকে নষ্ট করে দেয়। যুদ্ধের বহুদিন পরও ইউরোপের মানুষ আমরা ও তারা, মিত্রশক্তি ও শত্রুশক্তি- এরূপ চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব

পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার উত্থান (Rise of Russia and the USA as Superpower)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে মিত্রপক্ষ ও অক্ষশক্তির দেশগুলো (যেমন- ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, ইতালি, জার্মানি) ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন অগণিত লোকের মৃত্যু, অবকাঠামো ধ্বংস ও সম্পদহানির ফলে এসব দেশ যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার উত্থান ঘটে। একদিকে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব তাদের দ্রুত সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অপরদিকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে কম ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব মোড়লে পরিণত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব

শ্রমিকের মুক্তি (Emancipation of Labour Force)

যুদ্ধের সময় ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণি সমাজে তাদের গুরুত্ব বুঝতে পারে। তারা বুঝতে পারে তাদের শ্রমের মাধ্যমেই রাষ্ট্র সম্পদশালী হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকদের মধ্যে অসংখ্য সংগঠন গড়ে ওঠে। রুশ বিপ্লবের ফলে শ্রমিকশ্রেণি লাভবান হলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক জাগরণ ঘটতে শুরু করে। এর ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্র শ্রমিকবান্ধব আইন প্রণয়ন করে। এতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক মন্দা (Economic Depression)

যুদ্ধের পর যুদ্ধ ফেরত সৈনিকরা দেশে দেশে, বিশেষত জার্মানিতে বেকার হয়ে পড়ে। এর ফলে বেকারত্ব বাড়ে। কলকারখানাগুলোতে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। ফলে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব

সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশ (Development of Newspaper Industry)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের পররাষ্ট্র নীতির প্রতি সাধারণ লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। লোকে সংবাদপত্র পাঠ করে তাদের কৌতূহল মেটাতে চেষ্টা করে। এর ফলে সংবাদপত্র শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

প্রযুক্তি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশ (Development of Technology and Medical Science)

যুদ্ধাহত সৈনিকদের সেবা ও মারণাস্ত্রের সহজ প্রয়োগ-এর বাস্তব প্রয়োজনে যুদ্ধের সময় থেকেই প্রতিটি রাষ্ট্র চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দেয়। ফলে এসব ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটে।

পরিবহন খাতে অগ্রগতি (Development in Transportation Sector)

যুদ্ধের প্রয়োজনেই দ্রুত যোগাযোগব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে গিয়ে আকাশপথে মালামাল পরিবহনের জন্য বিমান নির্মাণ ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটে। এ যুদ্ধের সময়ই প্রথম আকাশপথে পরিবহন ও আকাশ যুদ্ধের সূচনা ঘটে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অব নেশনস

টপিক – ০৬ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের কারণ

টপিক ০৬: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের কারণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের কারণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ডের যোগদানের কারণ

১৮৭০ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়া যুদ্ধের পর ইউরোপে যে স্থিতাবস্থার সূত্রপাত হয় ব্রিটেন তা অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী ছিল। কেননা ইংল্যান্ড এ সময় বিশ্বের প্রায় ৫০ ভাগ উপনিবেশের অধিকারী ছিল। নৌশক্তিতে বলীয়ান হওয়ায় এবং বিশ্বের সবগুলো সমুদ্র ইংল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণে থাকায় উপনিবেশসমূহের বাণিজ্যে তার একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারে সমস্যা ছিল না। ইউরোপের স্থিতাবস্থা তার শক্তিশালী অবস্থানের জন্য সহায়কই ছিল। কিন্তু ইউরোপের নতুন পরাশক্তি জার্মানি নৌশক্তি অর্জনের আশায় বিশাল বিশাল নৌবহর গঠন করতে শুরু করলে ইংল্যান্ডের সমুদ্র বাণিজ্য হুমকির সম্মুখীন হয়। ১৮৯৭-১৯০০ সাল পর্যন্ত জার্মানি কতিপয় নৌ-নির্মাণ আইন পাস করে নৌশক্তিতে ইংল্যান্ডের সমকক্ষতা অর্জনের উদ্যোগ নিলে ১৯০১ ও ১৯০২ সালে ইংল্যান্ড জার্মানির সাথে মৈত্রী স্থাপনের প্রস্তাব দেয়। তবে জার্মানি তা প্রত্যাখ্যান করে।

বার্লিন মধ্যপ্রাচ্যের বাগদাদ রেলপথ নির্মাণের অধিকার লাভ করলে নিকট প্রাচ্য ও ইউরোপে জার্মানির প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এদিকে তুরস্কের সাথে জার্মানির বন্ধুত্ব স্থাপিত হলে প্রাচ্যে ইংল্যান্ডের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্য ইংল্যান্ড ফ্রান্সের সাথে তার সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলে এবং রাশিয়ার সাথে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এভাবে গঠিত ত্রিশক্তি আঁতাতের মাধ্যমে ইংল্যান্ড জার্মানিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের কারণ

১৮৩৯ সালের লন্ডন চুক্তির মাধ্যমে জার্মানি, ফ্রান্স ও ব্রিটেন এই স্বীকৃতি ও নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল যে, বেলজিয়ামকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে রক্ষা করা হবে। ইংল্যান্ডের জন্য বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের (নেদারল্যান্ডস) নিরপেক্ষতা প্রয়োজন ছিল। কেননা, এটা না হলে শত্রুপক্ষ সেগুলোকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ইংল্যান্ডে সফল আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে।

এসব কারণে যুদ্ধের শুরুতেই লন্ডন চুক্তি ভঙ্গ করে জার্মানি বেলজিয়ামে ঢুকে পড়লে ৪ আগস্ট ইংল্যান্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের কারণ

ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে নিরপেক্ষ থাকার ঘোষণা দেয়। ১৮২৩ সালে প্রণীত 'মুনরো ডকট্রিন' (Monroe Doctrine) অনুসরণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মার্কিনীরা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যুদ্ধকালীন নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে যেকোনো দেশে তার বাণিজ্য জাহাজ পাঠাবার অধিকার রয়েছে বলে দাবি করেছিল। মার্কিন ব্যবসায়ীরা চেয়েছিল যে যুদ্ধের সময় জার্মানি, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছে বিপুল রসদ ও যুদ্ধসামগ্রী বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে। বাস্তবে দেখা গেল, এ অস্ত্র ও রসদের বড় ক্রেতা হচ্ছে ব্রিটেন ও ফ্রান্স। মার্কিন রসদ ও অস্ত্র বোঝাই জাহাজগুলো যাতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সে যেতে না পারে সেজন্য জার্মানি ডুবোজাহাজের মাধ্যমে সেগুলো আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবিয়ে দিতে থাকে। তাছাড়া ১৯১৬ সালে ব্যাপক ডুবোজাহাজ আক্রমণের ভয়ে মার্কিন মালবাহী জাহাজগুলো নিজেদের বন্দরগুলোতে আটকা পড়ে। ফলে লক্ষ লক্ষ টন রপ্তানিযোগ্য গম ও শিল্পদ্রব্য গুদামে পচতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের কারণ

এ কারণে মার্কিন কংগ্রেস ও সিনেটররা জার্মানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট উইলসনের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানিকে ডুবোজাহাজ আক্রমণ বন্ধ করার জন্য হুমকি প্রদান করে। এতে প্রথমদিকে জার্মানি কিছুটা সংযত হয়। কিন্তু ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে জার্মানি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চারদিকে ডুবোজাহাজের বলয় তৈরি করে এবং মার্কিন সরকারকে জানিয়ে দেয় যে, এ বলয় ভেদ করে মার্কিন মালবাহী জাহাজ বা যাত্রীবাহী জাহাজ ঢুকলে তাতে মার্কিন নাগরিকদের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির জন্য জার্মানি কোনো দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। জার্মানির এ একতরফা ঘোষণা মার্কিনিদের মধ্যে অপমানবোধ সৃষ্টি করে। শেষপর্যন্ত মার্কিন যাত্রীবাহী বিলাস তরণী 'লুসিট্যানিয়া'-কে জার্মান ডুবোজাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবিয়ে দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ফলে ১৯১৭সালের ৬ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দেয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অব নেশনস

টপিক – ০৭ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ

টপিক ০৭: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ

This Topic is important for

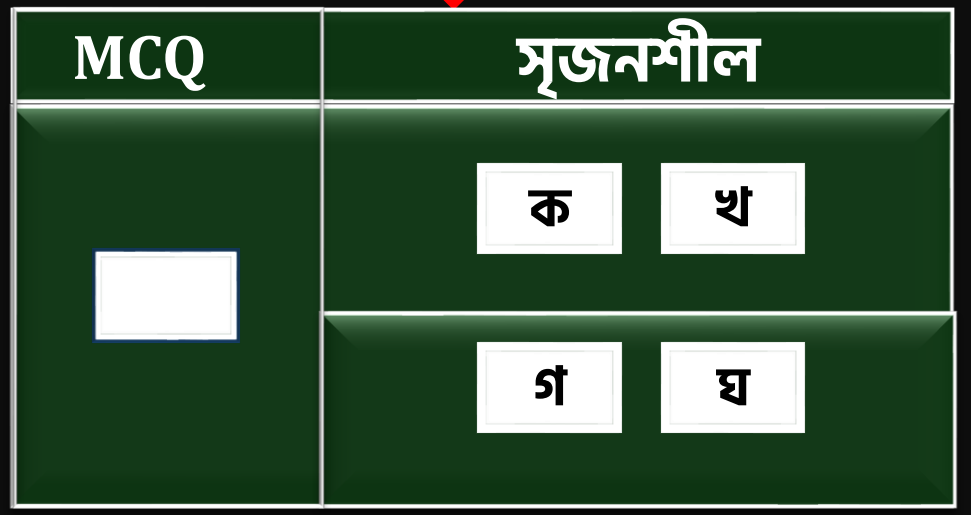

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানি সমরশক্তির দিক দিয়ে বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।" ১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়া যুদ্ধের পর বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হলে সেখানে অবিশ্বাস্য গতিতে শিল্পবিপ্লব ঘটে। শিল্পবিপ্লবের অর্জিত আয় দিয়ে জার্মানি অতিদ্রুত সাফল্যজনকভাবে তার সমরসম্ভার সমৃদ্ধ করে। এ সময় জার্মান সমরনায়ক ও বুদ্ধিজীবীরা তাদের লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে জার্মান জনতার মধ্যে প্রবল জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তোলেন। জার্মান জনসাধারণের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রবল হয় যে, তারা টিউটনিক জাতির উত্তরাধিকারী হিসেবে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ জাতি। ফলে পুরো বিশ্বকে তারা পদানত করতে সক্ষম। এ বোধ থেকে জার্মানি অতিদ্রুত ইউরোপের শ্রেষ্ঠ স্থলশক্তিতে পরিণত হয়। জার্মানির কামান ও ডুবো জাহাজের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে রণ পরিকল্পনা, অস্ত্রশস্ত্র, সম্পদ ও লোকবল সকল দিক থেকে জার্মানি মিত্রশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। জার্মানি কেমন সামরিক শক্তি অর্জন করেছিল তা বোঝা যায় এ তথ্য থেকে যে, কোলন নগরের সেতু দিয়ে প্রতি দশ মিনিটে একটি সামরিক ট্রেন চলত। এরপরও জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় বরণ করে। এর কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা নিচে উল্লিখিত যুক্তিগুলোকে চিহ্নিত করেছেন:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ

যুদ্ধের দীর্ঘসূত্রিতা (Procrastination of the War)

জার্মানির লোকবল ও অস্ত্রসম্ভার ছিল স্বল্পকাল স্থায়ী যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত। দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধে জার্মানি তার সেনাদলে রিক্রুট করতে পারেনি। অপরদিকে, ত্রিশক্তি আঁতাতের সম্পদ ও শক্তি এমন ছিল যে, তারা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভার বহন করতে পারত। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড তাদের সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা উপনিবেশ থেকে সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহে সক্ষম ছিল। কিন্তু জার্মানির পক্ষে এভাবে শক্তি বৃদ্ধির কোনো সুযোগ ছিল না। এ জন্য মিত্রপক্ষ যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করার প্রয়াস নেয়। জার্মানি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভার বহন করতে না পেরে একসময় পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ

অপর্যাপ্ত নৌশক্তি (Insufficient Naval Power)

ব্রিটেন ছিল বিশ্বের এক নম্বর নৌশক্তিধর দেশ। এর সাথে ফ্রান্সের নৌবহর যুক্ত হওয়ায় উত্তর সাগরে ব্রিটেন এবং ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ কার্যকর করতে সমর্থ হয়। ভূমধ্যসাগরে ফরাসি নৌ-বহর এবং উত্তর সাগরে ব্রিটিশ নৌ-বহর জার্মান উপকূলকে ঘিরে রেখেছিল। এর ফলে জার্মানি অপরাপর দেশ থেকে অস্ত্র ও রসদের সরবরাহ চালু রাখতে পারেনি। জার্মানির সাবমেরিনগুলো ব্রিটেনের রণতরিগুলোর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হলেও ব্রিটেন দ্রুত বিধ্বংসী অস্ত্র আবিষ্কার করলে নৌশক্তিতে জার্মানি ক্রমেই ইঙ্গ-ফ্রাঙ্ক জোটের কাছে পরাজিত হয়। হেলিগোল্যান্ডের নৌযুদ্ধে জার্মান নৌবহরের এমন ক্ষয়ক্ষতি হয় যে, জার্মান নৌবহর এরপর আর ব্রিটিশ নৌবহরকে আক্রমণ করতে সাহস করেনি। অপরদিকে, ব্রিটেন ও ফ্রান্স নৌপথে তাদের উপনিবেশগুলো থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র, লোকবল ও রসদ সংগ্রহ করে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে টিকে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ

একাধিক রণাঙ্গন মোকাবিলা (Facing Multiple Battlefield)

জার্মানির পরাজয়ের অন্যতম কারণ এটিও ছিল যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৯১৭ সাল পর্যন্ত জার্মানিকে একই সাথে পূর্ব সীমান্তে রাশিয়া ও পশ্চিম সীমান্তে ইঙ্গ-ফ্রাঙ্ক বাহিনীর মোকাবিলা করতে হয়। এর ফলে কোনো এক রণাঙ্গনে জার্মানি তার পুরো শক্তি প্রয়োগ করতে পারেনি। ফলে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। জার্মানি যদি কূটনীতির মাধ্যমে রাশিয়াকে ত্রিশক্তি আঁতাত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারত, তবে শুরুতেই জয়লাভ করতে পারত। কিন্তু জার্মানির কাইজার ত্রিশক্তি আঁতাত জোটে ভাঙন ধরাতে পারেনি। ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করলে জার্মানির জয়লাভের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষতা-ভঙ্গ করে মিত্রপক্ষে যোগদান করলে রাশিয়ার শূন্যতা পূরণ হয়ে যায়। ফলে জার্মানির একার পক্ষে এ ত্রয়ী শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। মিত্রপক্ষের সম্মিলিত শক্তি জার্মানি অপেক্ষা বেশি ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ

ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Position)

জার্মানি ইউরোপের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং এর ভৌগোলিক সীমা ছিল সীমিত। এ কারণে সে ছিল আক্রমণে পটু। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে জার্মানির জয়লাভের সম্ভাবনা কম ছিল। কারণ ব্যাপক আক্রমণের মুখে পিছু হটে আত্মরক্ষা করার মতো পশ্চাৎভূমি তার ছিল না। এক্ষেত্রে রাশিয়া তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। এ কারণে জার্মানি পরাজিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ

ফরাসিদের জনযুদ্ধ (Civil War of the French)

পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্স জনযুদ্ধ আরম্ভ করে। ফ্রান্স ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৮৭০ সালের পরাজয়ের গ্লানি তারা ভুলতে পারেনি। তারা প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর ছিল। এ জন্য যুদ্ধের শুরুতেই ফরাসি জনগণ জনযুদ্ধ শুরু করলে জার্মান সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৯১৭ সালে জার্মানি দ্বিতীয়বারের মতো ফ্রান্স আক্রমণ করলে ফরাসি জনগণ দেশ রক্ষায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে। ফলে জার্মানি সফল হতে পারেনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রপক্ষে যোগদান (USA's Joining Hands with the Allied Force)

জার্মানির যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো বিপুল সম্পদে পরিপূর্ণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রপক্ষে যোগদান। ১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়। এর ফলে মিত্রপক্ষের সরবরাহ লাইন অক্ষুণ্ণ থাকে। অপরপক্ষে মিত্রপক্ষের নৌ-অবরোধে জার্মানির রসদ ফুরিয়ে যায়। তাই তারা দীর্ঘ ক্লান্তিকর যুদ্ধে আর পেরে ওঠেনি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অব নেশনস

টপিক – ০৮ ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

টপিক ০৮: ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

প্রেক্ষাপট

১৯১৮ সালের প্রথম ভাগে মার্কিন সৈন্য ফ্রান্সে উপস্থিত হয়। এর কিছুকাল পরে জার্মানির মিত্র তুরস্ক, রুমানিয়া, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া ইত্যাদি দেশ মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলে জার্মানি একা হয়ে পড়ে। এরপরও জার্মানি কিছুকাল লড়াই অব্যাহত রাখে। কিন্তু জার্মানির অভ্যন্তরে কাইজারবিরোধী গণতন্ত্রপন্থিরা প্রবল গোলযোগ সৃষ্টি করলে কাইজার উইলিয়াম পালিয়ে যান। মিত্রপক্ষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, জার্মানির পতন আসন্ন। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করে অযথা লোকক্ষয় রোধ করার জন্য ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) তার বিখ্যাত ১৪ দফা মার্কিন কংগ্রেসে উত্থাপন করেন। উইলসন চেয়েছিলেন, এ চৌদ্দ দফার ভিত্তিতে জার্মানি ও মিত্রপক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

প্রেক্ষাপট

১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর চৌদ্দ দফার ভিত্তিতে জার্মানি যুদ্ধবিরতির আবেদন করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এর স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিজয়ী দেশগুলো ১৯১৯ সালের ১৮ জানুয়ারি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে মিলিত হয়। বিশ্বের ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ প্যারিস শান্তি সম্মেলনে মিলিত হয়। এ শান্তি সম্মেলন বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন, যেখানে বিজয়ী ও বিজিত উভয়পক্ষই স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে আলোচনায় মিলিত হওয়ার জন্য আহূত হয়। তবে শেষপর্যন্ত পরাজিত জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার প্রতিনিধিদেরকে আলোচনায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। আলোচনার পর চুক্তিপত্র রচনা সম্পন্ন হলে তাদের স্বাক্ষর করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল মাত্র। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ৩টি নীতির ওপর ভিত্তি করে বিজয়ী ও বিজিত শক্তিগুলো ৫টি সন্ধিতে স্বাক্ষর করে। এ ৫টি সন্ধি পরাজিত ৫টি দেশ জার্মানি, তুরস্ক, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরির সাথে করা হয়। জার্মানির সাথে যে চুক্তিটি করা হয়। সেটি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে স্বাক্ষরিত হয় বলে এটি ভার্সাই সন্ধি নামে পরিচিত। এ সন্ধিকে বিশ্বের অন্যতম বিতর্কিত ও ত্রুটিপূর্ণ চুক্তি বলে মনে করা হয়। অনেকে মনে করেন, ভার্সাই সন্ধির ত্রুটিগুলোর মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল।

ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলি

১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির শর্তাবলি নির্ধারণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, ব্রিটেন ও জাপান দাপ্তরিক কার্যাবলি সম্পাদন করে। কিন্তু শীঘ্রই ইতালি ও জাপান সম্মেলন থেকে সরে দাঁড়ালে অবশিষ্ট ৩টি রাষ্ট্রই এ চুক্তির প্রধান প্রধান ধারা ও শর্তাবলি রচনা করে। এ সন্ধির প্রধান ধারাগুলো হলো:

ক. ভৌগোলিক শর্তাবলি (Geographical Provisions)

১. ঐতিহাসিক ন্যায়বিচার নীতি অনুযায়ী জার্মানি আলসাস ও লোরেন অঞ্চল ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দিতে এবং খনিজ সমৃদ্ধ সার অঞ্চল পনেরো বছরের জন্য ফ্রান্সকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সার এলাকার শাসন জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে আনা হয় এবং বলা হয় পনেরো বছর পর গণভোটের মাধ্যমে এর ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

২. বেলজিয়ামকে ইউপেন, মরিসনেট, ম্যালমেডি অঞ্চলগুলো ছেড়ে দিতে জার্মানি বাধ্য হয়।

ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলি

৩. জার্মানির উত্তর সীমান্তের 'স্লেজভিগ প্রদেশ' ডেনমার্ক জার্মানিকে ফেরত দেবে বলা হয়।

৪. জার্মানি মেমেল অঞ্চল লিথুয়ানিয়াকে হস্তান্তর করবে।

৫. স্বাধীন ও সার্বভৌম পোল্যান্ড প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়ার অংশ বিশেষ নিয়ে এটি গঠিত হয়। জার্মানি তার পোসেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া পোল্যান্ডকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। খনিজ সমৃদ্ধ সাইলেশিয়ার অংশ বিশেষও পোল্যান্ডকে দেওয়া হয়। পোল্যান্ড যাতে সমুদ্রের সাথে যুক্ত হতে পারে সেজন্য জার্মানির মধ্য দিয়ে একটি যোগাযোগকারী রাস্তা করে দেওয়া হয়।

ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলি

৬. চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, ফিনল্যান্ড ইত্যাদি কয়েকটি নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়।

৭. জার্মানির ডানজিগ বন্দরকে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এ বন্দরটি জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

৮. জার্মানির পূর্ব সীমান্তের প্রদেশ সাইলেশিয়াকে তিন ভাগ করে একভাগ জার্মানির সাথে, একভাগ চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে এবং বাকি অংশ পোল্যান্ডের সাথে যুক্ত করা হয়।

৯. শ্লেজউইক-হোলস্টেন ডেনমার্ককে ফেরত দেওয়া হয়।

১০. অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি নামে দুটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়।

১১. জার্মানির পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ফ্রান্সে আক্রমণের আশঙ্কা দূর করার জন্য রাইনল্যান্ডে ১৫ বছরের জন্য মিত্র বাহিনীর সৈন্য মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয়।

১২. আফ্রিকা ও দূরপ্রাচ্যের উপনিবেশগুলোর ওপর থেকে জার্মানির অধিকার বিলুপ্ত করা হয়। দূরপ্রাচ্যের উপনিবেশগুলো জাপানকে দেওয়া হয় এবং অপরাপর উপনিবেশগুলো জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হয়। এগুলোতে ম্যান্ডেট হিসেবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে শাসন করতে দেওয়া হয়।

ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলি

ক. ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত ধারা (Provisions of Compensation): যুদ্ধের সব দায়-দায়িত্ব জার্মানির ওপর চাপানো হয় এবং জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন গঠন করে তিন বছরের মধ্যে একটি রিপোর্ট প্রদান করতে বলা হয়। এর মাধ্যমে জার্মানির কাছ থেকে ১৩২ বিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা আদায় করা হয়। যার ৫২% ইংল্যান্ড, ২২% ফ্রান্স, ১০% ইতালি এবং বাকি অংশ অন্য মিত্রপক্ষীয় দেশগুলোকে প্রদান করা হয়।

খ. অর্থনৈতিক ধারা (Economic Provisions): রাইন নদীকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জার্মানি মিত্রশক্তিকে কয়লা, কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করতে বাধ্য হয়। এ সন্ধির ২৩৪ ধারায় বলা হয় যে, মিত্রশক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য জার্মানির বাজারে মিত্রশক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলি

গ. সামরিক বিষয় সংক্রান্ত ধারা (Military Terms): জার্মানির সৈন্যসংখ্যা এক লাখে সীমিত করা হয়। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা বন্ধ করা হয়। যুদ্ধের সরঞ্জাম উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। জার্মানির সেনাপতিমণ্ডলীকে বরখাস্ত করা হয়। জার্মানির যুদ্ধ জাহাজগুলোকে ইংল্যান্ডের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়। জার্মানি কেবল ৬টি ছোট যুদ্ধ জাহাজ, ৩টি ছোট ক্রুজার, ৪টি ডেস্ট্রয়ার, ১২টি সাবমেরিন রাখার অধিকার পায়। রাইন নদীর পশ্চিম তীরে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে সব জার্মান দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি ভেঙে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়। হেলিগোল্যান্ডের নৌঘাঁটি বিলুপ্ত করা হয়। এসব সামরিক শর্তাবলি বাস্তবায়নের জন্য জার্মানিতে মিত্রপক্ষের সৈন্য মোতায়েন রাখার বিধান করা হয়।

ঘ. জাতিপুঞ্জ সংক্রান্ত ধারা (Terms Related to the League of Nations): ভবিষ্যতে বিশ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ রোধ করা এবং আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। বলা হয় বিশ্বের সব স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত ও ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসপ্রাপ্ত দেশ এর সদস্য হতে পারবে। বিশ্বের বৃহৎ ৫টি দেশ নিয়ে একটি বিশেষ পরিষদ এবং যোগদানকারী অপর সব রাষ্ট্র নিয়ে একটি সাধারণ সভা (General Assembly) গঠনের কথা বলা হয়। সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভা নগরীতে জাতিপুঞ্জের স্থায়ী কার্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা

ভার্সাই সন্ধিকে বলা হয়, পরাজিতদের প্রতি বিজিতদের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার দলিল। ১৮৭০ সালে ফ্রান্স সেডানের যুদ্ধে জার্মানির কাছে পরাজিত হলে জার্মানি ফ্রান্সের ওপর কতিপয় শর্ত আরোপ করেছিল। তাই প্যারিসেই ফ্রান্স সম্মেলন আহ্বান করে সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তাছাড়া জার্মানি উড্রো উইলসনের চৌদ্দ দফায় প্রদত্ত নিশ্চয়তার ভিত্তিতে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানিকে চৌদ্দ দফার আলোকে মূল্যায়ন না করায় জার্মানি একে এক চরম প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করে। ডানজিগ বন্দরকে উন্মুক্ত করে, সার খনি সমৃদ্ধ অঞ্চলকে জার্মানি থেকে পৃথক করে এবং ৩০ লক্ষ জার্মানকে নবগঠিত চেকোশ্লোভাকিয়ায় হস্তান্তর করে মিত্রশক্তির নেতৃবর্গ উইলসনের ঘোষিত প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অমান্য করে। নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি অনুযায়ী জার্মানির সামরিক শক্তি খর্ব করা হলেও মিত্রশক্তি তাদের নিজেদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে। এছাড়া বিপুল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ আদায় করে জার্মানির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে ফেলা হয়। এ জন্য জার্মান জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদগণ ভার্সাই সন্ধিকে জবরদস্তি সন্ধি (Dictated Peace) বলে আখ্যায়িত করেন।

ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

ভার্সাই সন্ধির তাৎপর্য

ভার্সাই সন্ধির তাৎপর্য অপরিসীম। এ সন্ধির মাধ্যমে ইউরোপের রাজনৈতিক চেহারা পাল্টে যায়। 'একজাতি এক রাষ্ট্র' নীতির আলোকে নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠনের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কথাই চিন্তা করা হয়েছিল। এর ফলে ইউরোপে সংখ্যালঘু সমস্যার (Minority Problem) উদ্ভব হয়। প্রতিটি নতুন দেশে অন্য জাতির বহু সংখ্যালঘু অধিবাসীর উপস্থিতি ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করে। যার ফলে মাত্র ২০ বছরের মধ্যেই সন্ধিটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এজন্য ইতিহাসবিদ ডেভিড টমসন বলেছেন, 'এই সন্ধিটি ছিল ভুল জায়গায় নিদারুণ কঠিন এবং ভুল পদ্ধতিতে উদারপন্থি'।

ভার্সাই সন্ধির ফলে ইউরোপে শক্তি শূন্যতা দেখা দেয়। এ সন্ধির মাধ্যমে একদিকে জার্মানিকে কেটেছেঁটে দুর্বল করে ফেলা হয়। অপরদিকে, হ্যাপ্সবার্গ সাম্রাজ্য ভেঙে ফেলা হয়। এর ফলে পরবর্তী সময়ে নাৎসি দলের নেতৃত্বে জার্মানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ওপর আগ্রাসন চালালে এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়নি। তাছাড়া রাশিয়ার সাথে কোনো আলোচনা ছাড়াই রুশ-চেক, রুশ-পোলিশ ও রুশ-বাল্টিক সীমান্ত স্থির করায় রাশিয়া ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতা করে। ফলে ১৯৩৯ সালে রুশ-জার্মান সহযোগিতায় এ চুক্তি ভেঙে ফেলা হয় এবং বিশ্ব আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়।

ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯)

ভার্সাই সন্ধির তাৎপর্য

ভার্সাই সন্ধির পশ্চাতে মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে ফেলা। তবে জার্মানির কয়লা, লোহা ইত্যাদি খনিজ সম্পদ অধিগ্রহণ করায় যে গণঅসন্তোষ দেখা দেয়, সেই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে হিটলারের মত একনায়কের উত্থান ঘটে। জার্মান জাতি ছিল প্রবল জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু এ সন্ধিতে এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করে জার্মানদের একাংশকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্যদেশে সংখ্যালঘুতে পরিণত করায় জার্মান নাগরিকরা পিতৃভূমিতে ফিরে আসার জন্য ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে। এর ফলে ইউরোপের শান্তি বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানিকে তার অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার পরিবর্তে তার ওপর বিপুল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চাপিয়ে দেওয়ায় মিত্রপক্ষেরও খুব একটা লাভ হয়নি। ইতিহাসবিদ রাইকারের ভাষায়, 'হাসকে খাবার না দিয়ে তার কাছে স্বর্ণের ডিম প্রত্যাশা করা যেমন অবাস্তব, তেমনি জার্মানির কয়লা, লোহা ইত্যাদি সম্পদ অধিগ্রহণ করে তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করা ছিল অবাস্তব।'

ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে পরাজিত জার্মানদের প্রতি যে ঘৃণা ও অবিচার প্রদর্শন করা হয়েছিল তার ফলে সৃষ্ট অসন্তোষ তীব্র জাতীয়তাবোধের পুনরুত্থান ঘটায়। ফলে সন্ধিটি অচিরেই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অব নেশনস

টপিক – ০৯ লীগ অব নেশনস

টপিক ০৯: লীগ অব নেশনস

This Topic is important for

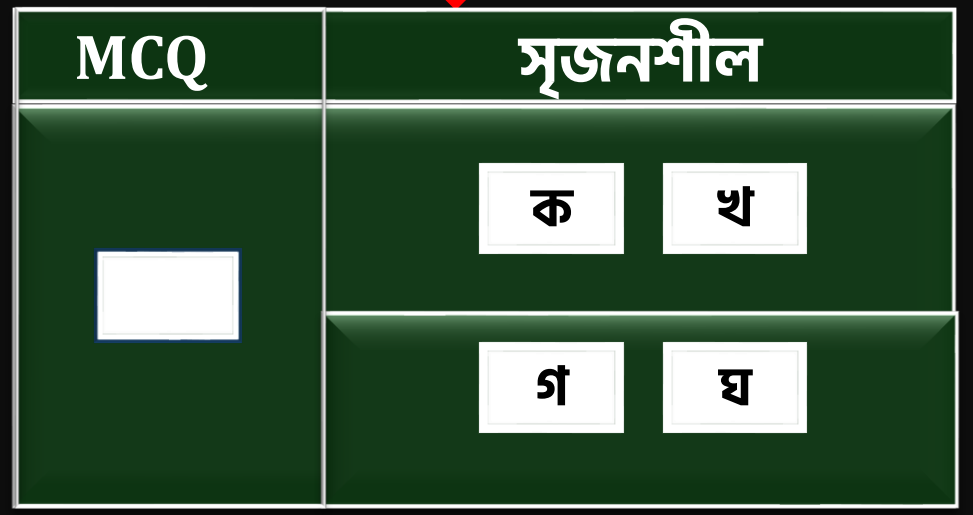

লীগ অব নেশনস

পটভূমি

ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রতিটি বড় ধরনের যুদ্ধের পর বিজয়ী পক্ষ যে বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করে তার স্থিতাবস্থার জন্য এক ধরনের সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর লক্ষ্য, যাতে পরবর্তীতে কেউ শান্তি বিনষ্ট করতে সক্ষম না হয়। নেপোলিয়নিক যুদ্ধের পর ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের মাধ্যমে এরূপ একটি শক্তি সমবায় গঠন করা হয়েছিল। ফলে তখন থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ইউরোপে শান্তি বিরাজ করে।

আবার ১৮৭১ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়া যুদ্ধের পর ত্রি-সম্রাট লীগ গঠনের মাধ্যমে এক ধরনের স্থিতাবস্থা আনার চেষ্টা করা হয়। এর ফলে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ইউরোপ বড় ধরনের কোনো যুদ্ধবিগ্রহের মুখোমুখি হয়নি (বলকান অঞ্চলের সমস্যা ছাড়া)। এদিক দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাস্তবতা ছিল একেবারেই ভিন্নরকম। কেননা এ যুদ্ধের বীভৎসতা, মানব বিপর্যয় ও সম্পদহানি আগের সব রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছিল। এ যুদ্ধে ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ব্যবহার বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয়।

উড্রো উইলসন

লীগ অব নেশনস

পটভূমি

ভবিষ্যতে এরূপ যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে মানবসভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। এ আশঙ্কা থেকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এমন এক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন, যাতে করে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বৈশ্বিক সমস্যাবলি সমাধান করে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা যায়। এক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন সময়ে দুটো বড় উদ্যোগের চেষ্টা চলে। ১৯১৭ সালে পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট আর যুদ্ধ না করে আপস ও আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মেটানোর আহ্বান করেন। ব্রিটেনের জেনারেল স্মার্টস ফিলিমোর আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে আপসে বিরোধ মেটাবার জন্য প্রস্তাব দেন।

লীগ অব নেশনস

পটভূমি

এক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের ১৪ দফা শান্তি প্রস্তাব গুরুত্বের সজো গ্রহণ করা হয়। উইলসন তার প্রস্তাবের চতুর্দশ দফায় বলেছিলেন যে, সব জাতির প্রতি ন্যায়বিচার এবং সব জাতির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়তে হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিস শান্তি সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট উইলসনের শান্তি প্রস্তাব উত্থাপিত হলে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বা লীগের গঠনতন্ত্র রচনার জন্য ১৯ সদস্যের একটি কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। উইলসন ছিলেন এ কমিটির সভাপতি। এ কমিটি জাতিসমূহের একটি লীগ গঠনের জন্য একটি খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে। এ খসড়ার নাম ছিল লীগ কভেন্যান্ট। প্যারিসের সম্মেলনে কতিপয় বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে এ খসড়াটি অনুমোদিত হয়। এরপর ভার্সাই সন্ধির প্রথম খণ্ডে এ খসড়াটি গৃহীত হলে ১৯২০ সালে লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়।

লীগ অব নেশনস

লীগ অব নেশনস গঠনের উদ্দেশ্য

লীগ অব নেশনস গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখা, একে অপরকে আক্রমণ করতে নিরুৎসাহিত করা এবং কোনো সদস্য রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে সমবেতভাবে আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সহায়তা করা, সংখ্যালঘু সমস্যা, ম্যান্ডেট ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা এ লীগ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসন মানবতাবাদী ও আদর্শবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি তার ১৪ দফায় যেসব বিষয় উল্লেখ করেন তা বাস্তবায়ন করার জন্যই মূলত লীগ অব নেশনস গঠিত হলেও এর গঠনশৈলী ও কতিপয় ধারা উদ্দেশ্যের 'সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। উইলসনের ১৪ দফার চতুর্দশতম ধারা অনুযায়ী সব জাতির প্রতি সমান ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার
কথা বলা হলে জাপান সব জাতির সমান অধিকারের শর্তটি গঠনতন্ত্রে সংযোজন করতে দাবি জানালে ব্রিটেনের বিরোধিতায় তা গৃহীত হয়নি। কারণ এ ধারাটি সংযোজিত হলে ব্রিটেনের উপনিবেশগুলো হারাবার ভয় ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লীগ গঠনের পূর্বে যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল, লীগের গঠনতন্ত্রে তা প্রতিফলিত হয়নি।

লীগ অব নেশনস

লীগ অব নেশনস এর গঠন

লীগ অব নেশনসের ১০-১৬ ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১০ নং ধারার চুক্তিতে বলা হয়, লীগের সদস্যদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা লীগ রক্ষা করবে। অর্থাৎ কোনো রাষ্ট্র লীগের কোনো সদস্যকে আক্রমণ করলে লীগ সেই সদস্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায় বলপ্রয়োগ করবে। ১১ নং ধারায় যৌথ নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করা হয়। ১২ নং ধারায় বলা হয়, যদি কোনো বিরোধের কারণে আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্টের সম্ভাবনা থাকে তাহলে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে তা মীমাংসা করা হবে। ১৬ নং ধারাটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধারায় বলা হয় যে, যদি কোনো সদস্য ১২, ১৩, ও ১৫ নং ধারা লঙ্ঘন করে যুদ্ধ আরম্ভ করে তবে তাকে আক্রমণকারী ঘোষণা করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে অপর সদস্যরা অর্থনৈতিক অবরোধ করতে বাধ্য থাকবে। অপরাধী রাষ্ট্রকে সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা যাবে এবং প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।

লীগ অব নেশনস

লীগ অব নেশনস এর গঠন

লীগ অব নেশনস-এর দুটি শক্তিশালী অঙ্গ ছিল। একটি কাউন্সিল এবং অপরটি সাধারণ পরিষদ। বিশ্বের শক্তিধর ৫টি রাষ্ট্র যেমন- ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান এই কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য মনোনীত হয়। এছাড়া পরিষদে ৪টি অস্থায়ী সদস্যপদ সৃষ্টি করা হয়। কংগ্রেস অনুমোদন না করায় শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র এ কাউন্সিলে যোগদান করতে পারেনি। ফলে ৪টি স্থায়ী সদস্য নিয়ে লীগ অব নেশনস-এর কাউন্সিল গঠিত হয়। এ কাউন্সিলের এখতিয়ারের মধ্যে ছিল-

ক. লীগের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা।

খ. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কোনো বিরোধ দেখা দিলে আলোচনার মাধ্যমে তা মীমাংসা করা।

গ. আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

ঘ. সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

৬. ম্যান্ডেট সংক্রান্ত বিষয়াবলিতে সমাধান দেওয়া।

চ. লীগ অব নেশনস-এর সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া ইত্যাদি।

লীগ অব নেশনস

লীগ অব নেশনস এর গঠন

এ কাউন্সিলে কোনো মীমাংসার সূত্র বের করার জন্য সব সদস্যের একমত হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। একমাত্র প্রথাগত কোনো বিষয় ছাড়া অপর সব বিষয়ে পরিষদকে সর্বসম্মত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতো।

লীগের অপর অঙ্গ ছিল সাধারণ পরিষদ বা লীগ অ্যাসেম্বলি। এ অ্যাসেম্বলিতে সব সদস্য রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করতে পারত। বছরে অন্তত একবার এ অ্যাসেম্বলি অধিবেশনে মিলিত হতে পারত। তবে জরুরি অবস্থায় সাধারণ সভা জরুরি বৈঠকে মিলিত হতে পারত। লীগের সাধারণ সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করতেন লীগের মহাসচিব। সাধারণ সভায় প্রতিটি সদস্যের একটি করে ভোট ছিল। সাধারণ সভা যেকোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করে প্রস্তাব বা পরামর্শ দিতে পারত। এ সভা দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে নতুন সদস্য গ্রহণ করতে পারত। বার্ষিক বাজেট পেশ, আন্তর্জাতিক বিরোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সাধারণ সভাতেই উত্থাপন ও অনুমোদন করা হতো।

লীগ অব নেশনস

লীগ অব নেশনস এর গঠন

সব স্বাধীন রাষ্ট্র, স্বায়ত্তশাসিত, ডোমিনিয়ন-এর স্ট্যাটাসপ্রাপ্ত এবং ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলো লীগ অব নেশনস-এর সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারত। তবে এ পরিষদ শুধুমাত্র প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারত, কোনো প্রস্তাব বাস্তবায়নের বা ক্ষমতা এ পরিষদের ছিল না। সব ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা ছিল কাউন্সিলের হাতে। লীগ অব নেশনস-এর কার্যাবলি পরিচালনার জন্য একটি সচিবালয় ছিল। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে ছিল এর অফিস। এখানে সেক্রেটারি জেনারেল বা মহাসচিবের নির্দেশে কর্মকর্তারা কাজ করতেন। এ সচিবালয়ের কাজ ছিল কাউন্সিল ও সাধারণ পরিষদের সভার কার্যতালিকা রচনা করা; পরিষদ ও সাধারণ সভার নির্দেশকে কার্যে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি। লীগ অব নেশনসের অধীনে আরও দুটি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয় আন্তর্জাতিক আদালত ও আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর। আন্তর্জাতিক আদালত সব ধরনের আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আইনি প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত।'

লীগ অব নেশনস

বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লীগ অব নেশনস এর গুরুত্ব

লীগ অব নেশনস গঠিত হওয়ার পরবর্তী এক দশক এটি একটি সফল আন্তর্জাতিক সংস্থার মর্যাদা লাভ করে। এ সময়টিকে লীগের সুবর্ণ যুগ বলা হয়। এ সময়ে বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কোনো স্বার্থ ঘটিত দ্বন্দ্ব প্রকটিত না হওয়ায় লীগের পক্ষে আর্ন্তজাতিক বিরোধগুলোর নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। ফলে এটি একটি কার্যকর সংগঠন বলে প্রতিপন্ন হয়। এ সময়ের মধ্যে লীগ নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে সমর্থ হয়।

বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লীগ অব নেশনস এর গুরুত্ব

১. এলান্ড দ্বীপপুঞ্জ সংক্রান্ত বিরোধ (Conflict Regarding the Aland Islands): বাল্টিক সমুদ্রের এলান্ড দ্বীপপুঞ্জ ছিল ফিনল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর অধিবাসীরা জাতিগতভাবে সুইডেনের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় তারা সুইডেনের সাথে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। সুইডেনও এ দ্বীপের ওপর তার অধিকার দাবি করে। ফলে বাল্টিক অঞ্চলে গোলযোগের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। তখন সুইডেন ও ফিনল্যান্ড কেউই লীগ অব নেশনস-এর সদস্য না থাকায় এ সমস্যায় হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে লীগের আইনগত অধিকার ছিল না। ব্রিটেনের প্রস্তাবে জাতিসংঘ এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করে অনুসন্ধানের দায়িত্ব প্রদান করে। এ কমিটির রিপোর্ট অনুসারে এলান্ড দ্বীপপুঞ্জ ফিনল্যান্ডের অধীনে রাখা হয়। তবে এ দ্বীপের অধিবাসীদের জাতিগত স্বকীয়তা, সংস্কৃতি, জীবন ও সম্পদ সুরক্ষার জন্য একে নিরপেক্ষ অঞ্চল বলে ঘোষণা করে ফিনল্যান্ডকে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

২. সাইলেশিয়া সংকট সমাধান (Solution of Silesian Crisis): সাইলেশিয়া প্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে পোল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে লীগ অব নেশনস উভয় দেশের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। উভয় দেশ তা মেনে নেয়।

বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লীগ অব নেশনস এর গুরুত্ব

৩. তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যকার সীমানা বিরোধ (Turky-Iraq Border Conflict): তুরস্ক ও ইরাকের সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য লীগ একটি সীমানা কমিশন গঠন করে দেয়। কিন্তু কুর্দি জাতির বিদ্রোহে সীমানা কমিশনের কার্যক্রম ব্যাহত হলে তুরস্ক কুর্দিদের ওপর ভয়ানক অত্যাচার-উৎপীড়ন চালায়। এতে তুর্কি-ইরাক যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলে লীগ মধ্যস্থতা কুরে উভয়পক্ষকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়।

৪. করফু সংকট (Corfu Crisis): গ্রিস ও আলবেনিয়ার সীমান্ত জরিপ কাজে নিযুক্ত জনৈক ইতালীয় কর্মচারীকে গ্রিসে হত্যা করা হলে ইতালির একনায়ক মুসোলিনী লীগের তোয়াক্কা না করেই ১৯২৩ সালে নৌবহর পাঠিয়ে গ্রিসের করফু দ্বীপে গোলাবর্ষণ করে তা দখল করে নেয়। ইতালি অতঃপর গ্রিসের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণ দাবি করে। গ্রিস বিষয়টি লীগ কাউন্সিলে উত্থাপন করে। কাউন্সিলে এ সংক্রান্ত বিতর্ক চলার সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতরা পৃথকভাবে প্যারিসে মিলিত হয়ে বিষয়টি মীমাংসা করতে সমর্থ হন। গ্রিস ক্ষমাপ্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হলে সমস্যাটি মিটে যায়।

বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লীগ অব নেশনস এর গুরুত্ব

৫. গ্রিস-বুলগেরিয়া বিরোধ (Greece-Bulgaria Conflict): গ্রিস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে সীমান্তে বহু জটিল সমস্যা ছিল। ১৯২৫ সালে গ্রিস-বুলগেরিয়া সীমান্তে দুই জন গ্রিক সৈন্য নিহত হলে গ্রিস করফুর ঘটনার কথা স্মরণে রেখে বুলগেরিয়ার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণ দাবি করে। বুলগেরিয়া তদন্তের প্রস্তাব দিলে গ্রিস তা অগ্রাহ্য করে সৈন্য পাঠায়। এতে গ্রিস-বুলগেরিয়া সংঘর্ষ শুরু হয়। বুলগেরিয়া লীগ কাউন্সিলে অভিযোগ উত্থাপন করলে কাউন্সিল গ্রিক সেনাদের বুলগেরিয়া থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য করে। এছাড়া গ্রিসের ক্ষমাপ্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণ দাবি নাকচ করে দেয়। অধিকন্তু গ্রিসকে আক্রমণকারী আখ্যা দিয়ে বুলগেরিয়াকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৪২ হাজার পাউন্ড প্রদান করতে নির্দেশ দেয়। এভাবে গ্রিস-বুলগেরিয়া সংকটের নিষ্পত্তি ঘটে। লক্ষণীয় যে, করফু ঘটনার সময় লীগ ইতালিকে আক্রমণকারী ঘোষণা দিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি। গ্রিস দুর্বল, তাই তার ওপর ব্যবস্থা নেওয়ায় লীগের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লীগ অব নেশনস এর গুরুত্ব

৬. পোল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া সংকট (Problem between Poland and Lithuania): এককালে 'ভিলনা' লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ছিল। ১৯০২ সালে পোল্যান্ড স্থানটি দখল করে। কিন্তু লিথুয়ানিয়া স্থানটির বৈধতার দাবি উত্থাপন করলে পোল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া বিরোধ শুরু হয়। ১৯২২ সালে লীগ এ সংকট সমাধানের জন্য গণভোটের আয়োজন করে। এতে 'ভিলনা' পোল্যান্ডের সাথে যুক্ত হওয়ার মত দিলে লীগ লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ডের সীমানা স্থির করে দেয়। ভিলনা পোল্যান্ডের অধিকারেই থেকে যায়।

এভাবে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত লীগ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধ মোটামুটি সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় সমর্থ হয়। কিন্তু ১৯৩১-এর পর বৃহৎ শক্তিগুলো পারস্পরিক স্বার্থে দ্বিধাবিভক্ত হলে লীগ তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। যেমন- জাপান ১৯৩১ সালে চীন আক্রমণ করে মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়। জাপান ছিল লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং চীন নবীন সদস্য। চীন লীগের কাছে ন্যায়বিচার দাবি করে আবেদন করলে ব্রিটেনের প্রভাবে লীগ জাপানের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু বিশ্ব জনমতের চাপে ও চীনা জাতীয়তাবাদীদের প্রচণ্ড গোলমালের কারণে লীগ এ সংক্রান্ত এক কমিশন গঠন করে। এদিকে জাপান মাঞ্চুরিয়ায় মাঞ্জুকুয়ো নামে এক তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করে তার সব দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে। কমিশন জাপানকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করলে এর প্রতিবাদে দেশটি লীগের সদস্যপদ পরিত্যাগ করে। কিন্তু ব্রিটেনের প্রভাবে লীগ জাপানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়।

লীগ অব নেশনস

বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লীগ অব নেশনস এর গুরুত্ব

১৯৩৫ সালে ইতালি আবিসিনীয় সীমান্তে 'ওয়াল ওয়াল' গ্রামে গুলিবর্ষণ করলে আবিসিনিয়া লীগ কাউন্সিলে আবেদন জানায়। লীগ ঘটনা তদন্তে কমিশন গঠন করে, তবে তা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের চাপে অকার্যকর করে রাখা হয়। ইতোমধ্যে ইতালি আবিসিনিয়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করলে লীগ একের পর এক কমিশন গঠন করলেও ব্রিটেনের চাপে সে কমিটিগুলোর রিপোর্ট বাতিল হয়ে যায়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভেবেছিল ইতালির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে ফ্যাসিবাদী ইতালি নাৎসিবাদী জার্মানির সাথে ঐক্যবদ্ধ হলে ইউরোপের শক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট হবে এবং তা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য তারা ইতালিকে লীগের মাধ্যমে শাস্তি দিতে অনীহা প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের নিজ দেশের জনমতের চাপে ইতালিকে আক্রমণকারী ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় এবং লীগ গঠনতন্ত্রের ১৬ নং ধারা অনুযায়ী ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করে। কিন্তু ইতালি লীগের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সদস্যপদ পরিত্যাগ করে। এভাবে ১৯৩১ সালের পর বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের স্বার্থে লীগকে অমান্য করতে শুরু করলে এর কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। লীগ অব নেশনস-এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেলে যৌথ নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়। এর ফলে বিশ্ব আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে লীগ অব নেশনস ব্যর্থ হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হয়। লীগের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ১৯২৩ সালে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা গঠিত হলে প্রাচ্যদেশে কলেরা, প্লেগ ও ম্যালেরিয়া দমনে এটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়।

লীগ অব নেশনস

বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লীগ অব নেশনস এর গুরুত্ব

১৯২০ সালে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে লীগের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাধা দূর করার জন্য বহুবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক স্বার্থ নির্ধারণ, শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ, সভঙ্গতিপূর্ণ আমদানি শুল্ক, দাস বাণিজ্য বিলোপ সাধন, মূলধন ও পণ্য চলাচলে বাধা দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসংখ্য কার্যকর সুপারিশ প্রণয়ন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের পুনর্গঠনে লীগ অব নেশনস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। যদিও রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসায় লীগ 'তেমন সফল হয়নি, তবে এর অর্জনও কম নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লীগের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ এর সাধারণ পরিষদের হাতে কোনো ক্ষমতা ছিল না। আর কাউন্সিল ছিল বৃহৎ শক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণে। এর ফলে লীগ বৃহৎ শক্তিবর্গের ক্রীড়নকে পরিণত হয়।

লীগ অব নেশনস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানবজাতির জন্য এক কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে শুরু হওয়া এ যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়েছে সমগ্র বিশ্বে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিশ্বে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক এবং ভয়াবহ ছিল এ যুদ্ধ। কারণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বিশ্বের সব শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো। আর যুদ্ধে ব্যবহৃত সমরাস্ত্রগুলো উন্নত এবং ধ্বংসাত্মক। পূর্ব ও পশ্চিম দুটি রণাঙ্গনে ভাগ হয়ে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের সদস্য ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দেশগুলো। অন্যদিকে অক্ষ শক্তির নেতৃত্বে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও তুরস্ক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের মানচিত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা মারাত্মক হওয়ার কারণ ছিল যুদ্ধে ব্যবহৃত আধুনিক ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্র। যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের মধ্যে ছিল বিমানবাহী রণতরি, ফাইটার ও ইন্টারসেন্টার, বোমারু ও গ্রাউন্ড অ্যাটাক বিমান, দুর্ভেদ্য পরিখা, মেশিনগান এবং শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী। ব্রিটিশ নৌ বাহিনীর এইচএমএস ফিউরিয়ার্স এর আক্রমণাত্মক গতিধারা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফাইটার ইন্টারসেন্টারের অতি স্কাউটি এয়ারকো ডিএইচ-২ এবং আর্মস্ট্রং হোয়াইটওয়ার্থ সিসকিন আকাশ পথে যুদ্ধ করে সমগ্র ইউরোপ ধ্বংসস্তূপে। পরিণত করে। তাছাড়া এডি সিসপ্লেন টাইপ ১০০০, এয়ারকো ডিএইচ-৪, অ্যাভরো ৫০৪ ও ভাইকার্স ভিমি নামক বোমারু বিমান ও গ্রাউন্ড অ্যাটাকে পিঁপড়ার মতো মানুষ মেরেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাড়ে ছয় কোটি সৈন্যের মধ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ সৈন্য প্রাণ হারান। ৭০ লক্ষ সৈনিক পঙ্গু হয়ে যান। চার বছর (১৯১৪-১৯১৮) স্থায়ী ঐ যুদ্ধে যত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে সমগ্র ইউরোপের ইতিহাসে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত যুদ্ধে এত মানুষের প্রাণহানি ঘটেনি। এ যুদ্ধে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল মিত্রশক্তি তথা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ববিবেককে বেশি আন্দোলিত করেছিল। কারণ এতে মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল বেশি। সামরিক আক্রমণ, খাদ্যের অভাব, অনেক প্রকার রোগ-মহামারি ইত্যাদি কারণে যুদ্ধে সাধারণ মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ যুদ্ধ চালাতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর দৈনিক ২৪ কোটি ডলার খরচ হয়েছে। যুদ্ধে মোট খরচ হয়েছিল ২৭ হাজার কোটি ডলার। এছাড়া যুদ্ধে হতাহত সৈন্যের স্থান পূরণ করতে ইউরোপের দেশগুলোতে সামরিক বৃত্তি গ্রহণে মানুষকে বাধ্য করা হয়। এর ফলে উদীয়মান কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিকদের যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়। সার্বিক দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মানুষের প্রাণহানি ছাড়াও অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষতি ছিল অপূরণীয়। এ যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে একটাই প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছে- আর তা হলো 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।'

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অব নেশনস

টপিক – ১০ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

টপিক ১০: অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

অস্ট্রিয়ার যুবরাজের সস্ত্রীক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। এ ঘটনার জেরে অস্ট্রিয়া ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে রাশিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনে সৈন্য সমাবেশ করে। জার্মানি ৩১ জুলাই ১২ ঘণ্টার মধ্যে রাশিয়াকে সৈন্য সরিয়ে নিতে বলে। রাশিয়া কোনো জবাব না দিলে জার্মানি ১ আগস্ট রাশিয়া ও ৩ আগস্ট ফ্রান্স আক্রমণ করে। এদিকে ২ আগস্ট তুর্কি সরকার জার্মানির পক্ষে যোগদান করে। জার্মানি বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ-করলে ৪ আগস্ট ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।'

লীগ অব নেশনস

লীগ অব নেশনস গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখা, একে অপরকে আক্রমণ করতে নিরুৎসাহিত করা এবং কোনো সদস্য রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে সমবেতভাবে আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সহায়তা করা, সংখ্যালঘু সমস্যা, ম্যান্ডেট। ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা এ লীগ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল। লীগ অব নেশনস-এর দুটি শক্তিশালী অঙ্গ ছিল। একটি কাউন্সিল এবং অপরটি সাধারণ পরিষদ। বিশ্বের শক্তিধর ৫টি রাষ্ট্র। যেমন- ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান এই কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য মনোনীত হয়।

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

ভার্সাই সন্ধি

ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মিত্রশক্তি জোটের সাথে পরাজিত জার্মানির যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাই ভার্সাই সন্ধি নামে পরিচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তি এবং অক্ষশক্তি জার্মানি ও তার মিত্রদের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে হয়েছিল বলে এই চুক্তিকে ভার্সাই সন্ধি নামে অভিহিত করা হয়। ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সম্মেলনে ৩২টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

ন্যাটো

ন্যাটো (NATO) একটি সামরিক জোট, যার পূর্ণরূপ হলো North Atlantic Treaty Organization। ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের ১১টি দেশের সাথে ২০ বছরের জন্য আত্মরক্ষামূলক সামরিক চুক্তি সম্পাদন করেন। পরে গ্রিস ও তুরস্ক ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত হয়। এ চুক্তিতে বলা হয়, চুক্তিভুক্ত কোনো রাষ্ট্রকে আক্রমণ করা হলে এ আক্রমণকে অপর সদস্যরা নিজেদের ওপর আক্রমণ বলে গণ্য করবে। সামরিক দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবরোধ করে রাখার নীতি কার্যকর করার জন্য ন্যাটো গঠিত হয়েছিল।

অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা

উগ্র জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদের চরম বিকৃত রূপ হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদ। উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা এমন একটি বিষয় যার জন্য একটি ভূ-খণ্ডের মানুষ সব বিষয়ে অন্ধভাবে দেশীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং দেশীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অন্য ভূ-খণ্ডের ক্ষতিসাধন করতেও পিছপা হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে জার্মানরা নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করত। এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে জার্মানরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

ত্রিশক্তি চুক্তি

এটি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। জার্মানি, অস্ট্রিয়া- হাঙ্গেরি ও ইতালি এ জোট গড়ে তোলে। ১৮৮৩ সালে তুরস্ক, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া এ জোটে যোগদান করে। বিসমার্ক যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন ত্রিশক্তি আত্মরক্ষামূলক ছিল পরে তা ব্যাহত হয় এবং আক্রমাত্মক নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

ত্রিশক্তি আঁতাত-

উদীয়মান পরাশক্তি জার্মানিকে মোকাবিলা করার জন্য ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের মাঝে যে আঁতাত হয়, তা ত্রিশক্তি আঁতাত নামে পরিচিত। এ আঁতাত ছিল ত্রিশক্তি জোট-এর হুমকি মোকাবেলায় গড়ে ওঠা ইউরোপীয় সামরিক জোট। দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ফলে এ আঁতাত গড়ে ওঠে। মূলত ১৮৯৩ সালে ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি, ১৯০৫ সালে ইঙ্গ-ফরাসি চুক্তি এবং ১৯০৭ সালে ইঙ্গ-রুশ চুক্তির ফল হচ্ছে ত্রিশক্তি আঁতাত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিস্তৃতি

তিনটি মহাদেশের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিস্তৃত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই থেকে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত চার বছর তিন মাস তের দিন স্থায়ী হয়েছিল। এতে একদিকে ছিল ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও সার্বিয়া। অপরপক্ষে ছিল জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরি। ইতালি ও রুমানিয়া জার্মানির পক্ষে থাকার কথা থাকলেও তারা নিরাপত্তা বজায় রেখেছিল। তিনটি মহাদেশের ৩৪টি দেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ যুদ্ধে অংশ নেয়।

THANK YOU